গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৬ বর্ষ ৩০ সংখ্যা ১২ মার্চ, ২০০৪ প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

কার্ল মার্কস স্মরণে

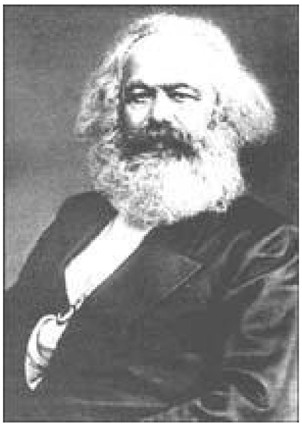

৫.৫.১৮১৮ — ১৪.৩.১৮৮৩

“মালিকশ্রেণীর সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সর্বহারা শ্রেণী, মালিকদের তৈরি পুরনো দলগুলি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের একটি পার্টিতে নিজেদের সংঘবদ্ধ করার দ্বারাই একমাত্র শ্রেণী হিসাবে নিজস্ব ভূমিকা পালন করতে পারে। সমাজবিপ্লব ও তার পরিণতিতে সমাজে শ্রেণী অবলুপ্তির সংগ্রামে বিজয় সুনিশ্চিত করার অপরিহার্য শর্ত হল এইরকম একটি রাজনৈতিক দলের মধ্যে সর্বহারাশ্রেণীকে সংগঠিত করা।”

(ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্কিংমেনস্ এ্যাসোসিয়েশনে মার্কসের বক্তৃতা, ১৮৬৪)

ধর্মঘট হলেই ‘গেল গেল’ রব

শ্রমজীবী মানুষের উপর সার্বিক আক্রমণ সম্পর্কে এরা নীরব কেন

কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির ডাকা গত ২৪ ফেব্রুয়ারি সারা ভারত সাধারণ ধর্মঘট অভূতপূর্বভাবে সফল হয়। কিন্তু এই ধর্মঘট সফল হবার সঙ্গে সঙ্গে যথারীতি সংবাদপত্র, দূরদর্শন সহ যাবতীয় প্রচারমাধ্যম একযোগে বন্‌ধের বিরুদ্ধে প্রচার শুরু করে দেয়। তারা দেখাবার চেষ্টা করে এই বন্‌ধের ফলে বিশেষ করে এ রাজ্যের কী মারাত্মক ক্ষতি হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে ৪৫ কোটি টাকা মূল্যের একটি বিনিয়োগ হাতছাড়া হয়ে যাবার উদাহরণও তারা তোলে। তাদের মতে এই বিনিয়োগের ফলে নাকি ২০০ জন বেকার যুবকের কর্মসংস্থান হতে পারতো। এইভাবে ২০০ মানুষের শোকে চোখের জলের বন্যা বইয়ে দিয়ে এ রাজ্যে বিনিয়োগ এবং কর্মসংস্থান না হওয়ার কারণ হিসাবে এরা আন্দোলন এবং বন্‌ধের দিকেই অভিযোগের আঙুল তোলে।

চাকরির এই প্রচণ্ড খরার বাজারে ২০০ জনের কর্মসংস্থান অবশ্য কোনমতেই কম কথা নয়। কিন্তু পুঁজি-মালিকদের মদতপুষ্ট এইসব সংবাদমাধ্যমের না জানার কথা নয় যে, আজ দেশে বেকারত্বের হাহাকার কত তীব্র, চাকরি না পেয়ে আর চাকরি হারিয়ে কী বিপুল সংখ্যক মানুষ আজ অসহনীয় জীবনযাপন করছে। এমনকি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারি দপ্তরগুলিতেও নতুন নিয়োগ বন্ধ, উপরন্তু সেখানেও ছাঁটাইয়ের হাত থেকে রেহাই নেই। এসব ঘটছে কেন? এর জন্য কি বন্‌ধ, আন্দোলন বা শ্রমিকরা দায়ী?

শুধু কর্মহীনতাই নয়, শ্রমজীবী মানুষের ওপর সমস্ত দিক থেকে আজ মারাত্মক আঘাত নেমে আসছে। ছাঁটাই-লেঅফ-ক্লোজারের দাপটে শ্রমিকশ্রেণী আজ বিপন্ন। নতুন

দুয়ের পাতায় দেখুন

ডাঃ নর্মান বেথুনের জন্মদিন ৪ মার্চ জনস্বাস্থ্যের দাবিতে কলকাতায় হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির বিক্ষোভ

কমরেড নীহার মুখার্জীর শারীরিক অবস্থা

প্রিয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী এখনও চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তবে চিকিৎসকদের মতে, তিনি পূর্বেকার উদ্বেগজনক অবস্থা কিছুটা কাটিয়ে উঠেছেন এবং তাঁর শারীরিক অবস্থার উন্নতির কিছু কিছু লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। বর্তমানে ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক অ্যান্ড হসপিটাল থেকে ছাড়া পেয়ে সল্টলেকের কেন্দ্রীয় কমিউনে তিনি চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ৯.৩.০৪

আন্দোলনের ধারায় আশার আলো

ডুয়ার্স ও তরাই-এর চা-শ্রমিকদের সাইকেল মিছিল

প্রায় দু'শ কিলোমিটার রাস্তাকে সামনে রেখে যাত্রা শুরু হয়েছিল ‘বেঙ্গল ডুয়ার্সে’র শেষ প্রান্ত কুমারগ্রাম থেকে। সংকোশ নদীর কিনার থেকে যে যাত্রা শুরু, তার সামনে ছিল রায়ডাক, কালজানি, তোর্ষা, জলঢাকা, তিস্তা নদী ; ছিল বক্সা টাইগার রিজার্ভ, জলদাপাড়ার অভয়ারণ্যের জঙ্গল ; ছিল না রাত্রিবাসের কোন নিশ্চিত ঠিকানা ; পাথেয়র কোন নিশ্চিত বন্দোবস্ত। জানা ছিল গন্তব্য জলপাইগুড়ি শহরের ডিএম অফিস। বন্ধ চা-বাগানের সরকারি অধিগ্রহণ, চা-শ্রমিকদের নিয়মিত ও পুরো বেতন, রেশন, প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা আত্মসাৎকারীর কঠোর শাস্তি প্রভৃতি দাবি নিয়ে ২৮ ফেব্রুয়ারি শামুখতলা থেকে শুরু হয়েছিল সাইকেল মিছিল। মিছিল শুরু হয়েছিল ২৫ জন নিয়ে, জলপাইগুড়ি শহরে যখন পৌঁছাল তখন সেই মিছিলে সামিল হয়েছে ৫০০ জন। ১লা মার্চ বেলা তখন ২টা।

শামুখতলা থেকে বের হবার পর ৩১নং জাতীয় সড়কে যুক্ত হল আরো কিছু মিছিল। যশোডাঙ্গা, সলসলাবাড়ী, চাপড়ের পারের শত শত মানুষের অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা নিয়ে সাইকেল আরোহীরা যখন আলিপুরদুয়ার শহরে পৌঁছল, তখন রাত্রির অন্ধকার নেমে এসেছে। মানবাধিকার আন্দোলনের কর্মী সুমন গোস্বামী, মার্কেট-ফান্ড ব্যবসায়ী সমিতির প্রতিনিধি সুবল ভাওয়াল সহ বহু সাধারণ মানুষ আলিপুরদুয়ার চৌপথিতে সহমর্মিতা ও সংহতি জ্ঞাপন করলেন। দু'কিলোমিটার বাদে আলিপুরদুয়ার নেচার ক্লাবের চেয়ারম্যান অমল দত্ত, পরিবেশবিদ শোভেন সান্যাল, পুর কমিশনার আশীষ দত্ত সহ বহু মানুষ মিছিলকে অভিনন্দন জানালেন। অংশগ্রহণকারীদের হাতে তুলে দিলেন

ছয়ের পাতায় দেখুন

‘বার’ বন্ধের দাবিতে হাবড়ায় ডি এস ও’র পৌরসভা অভিযান

‘বার’ বন্ধের দাবিতে এবং সরকারের নতুন মদের লাইসেন্স নীতির বিরুদ্ধে গত ৭ ফেব্রুয়ারি ডি এস ও’র নেতৃত্বে হাবড়ায় বিশাল ছাত্র বিক্ষোভ মিছিলে পুলিশের লাঠিচার্জের প্রতিবাদে সর্বাত্মক ছাত্রধর্মঘটের পর সর্বস্তরের ছাত্রছাত্রীরা অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠে। পৌরঅঞ্চলের সুস্থ সংস্কৃতি ধ্বংসকারী এই ‘বার’ অবিলম্বে বন্ধের দাবিতে ২০ ফেব্রুয়ারি পুনরায় এ আই ডি এস ও’র নেতৃত্বে হাবড়ায় ছাত্র বিক্ষোভ মিছিল ও পৌরসভা অভিযান সংগঠিত হয়। এলাকার ১০টি স্কুল ও ২টি কলেজের পাঁচ শতাধিক ছাত্রছাত্রী এই অভিযানে অংশগ্রহণ করে। হাবড়ার সর্বস্তরের সাধারণ মানুষ এই ছাত্র আন্দোলনকে সোৎসাহে সমর্থন ও সহযোগিতা করেন। হাবড়া হাইস্কুলের অষ্টম শ্রেণীর এক ছাত্র বলে — ‘‘আমার মা আমাকে কখনও স্কুল কামাই করতে দেয় না। কিন্তু মা নিজেই আমাকে স্কুল না করে আজকের মিছিলে আসতে বলেছে।’ দক্ষিণ হাবড়া স্কুলের নবম শ্রেণীর এক ছাত্রের মা ঐ দিন রাস্তায় ডি এস ও’র মিছিলে তার ছেলেকে না দেখতে পেয়ে বাড়ি ফিরে ছেলের কাছে জানতে চান কেন সে মিছিলে যায়নি। সুসজ্জিত ও সুশৃঙ্খল ছাত্র মিছিল ঐদিন পৌরসভায় পৌঁছানোর পর সেখানে এক সংক্ষিপ্ত সভায় একটি বিরাট মদের বোতলের প্রতিকৃতি পোড়ানো হয়। ছাত্রদের এক প্রতিনিধি দল পৌরকর্তৃপক্ষের কাছে ডেপুটেশন দিয়ে অবিলম্বে হাবড়ায় ‘বার’ বন্ধ করা ও অপসংস্কৃতির প্রসার রোধ করার জন্য পৌরসভাকে উদ্যোগী হতে দাবি জানায়। এরপর ছাত্র-মিছিল হাবড়া স্টেশনে এসে শেষ হয়। সেখানে এক সংক্ষিপ্ত সভায় এই আন্দোলনকে শক্তিশালী করার জন্য হাবড়ার সমস্ত স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে ‘ছাত্র সংগ্রাম কমিটি’ গঠিত হয়েছে।

এ আই ডি এস ও’র নেতৃত্বে এই ছাত্র আন্দোলন সমস্ত হাবড়াবাসীর মধ্যে গভীর আশার সঞ্চার করেছে।

‘বার’ বন্ধের দাবিতে হাবড়ায় নাগরিক কনভেনশন

রাজ্যের সি পি এম ফ্রন্ট সরকারের নতুন নতুন মদের দোকান ও ‘বার’ খোলার নীতি অনুযায়ী উত্তর ২৪ পরগণায় হাবড়ায় সম্প্রতি একটি বার খোলা হয়েছে। জনবহুল হাবড়া শহরে এই বার চালু হওয়ায় সর্বস্তরের হাবড়াবাসী ভীষণ উদ্বিগ্ন। এই বার অবিলম্বে বন্ধের দাবিতে বৃহত্তর হাবড়ার বিশিষ্ট নাগরিকদের উদ্যোগে গত ২২ ফেব্রুয়ারি হাবড়া স্টেট ব্যাঙ্ক প্রাঙ্গণে নাগরিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন হাবড়ার বামপন্থী আন্দোলনের বিশিষ্ট প্রবীণ নেতা পরিতোষ সরকার। কনভেনশনে বক্তব্য রাখেন ডাঃ সাধন সেন, অধ্যাপক রতনচন্দ্র ব্রহ্ম, অধ্যাপক গৌরীশঙ্কর দে, তপন রায়চৌধুরী, স্বপন মজুমদার, রামরতন মুখার্জী, শঙ্কর ঘোষ প্রমুখ নাগরিকবৃন্দ।

শিক্ষক নেতা তপন রায়চৌধুরী একটি গল্পের উদাহরণ টেনে দেখান যে মদের প্রভাব সমাজের পক্ষে কতটা ক্ষতিকারক। এর বিরুদ্ধে সর্বস্তরের মানুষকে সংঘবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য তিনি আহ্বান জানান। শঙ্কর ঘোষ তাঁর বক্তব্যে মদের নতুন লাইসেন্স নীতির তীব্র সমালোচনা করে বলেন সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের নীতিকেই এদেশে কার্যকর করতে গিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার মানুষের নৈতিক মানকে ধ্বসিয়ে দেবার জন্যই ঢালাও মদের দোকান ও ‘বার’-এর লাইসেন্স দিচ্ছে। বামপন্থী আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা ও এলাকার সর্বজনশ্রদ্ধেয় চিকিৎসক ডাঃ সাধন সেন বলেন, ‘‘আমার দল বামফ্রন্ট সরকারের শরিক হলেও আমি এই মদের নতুন লাইসেন্স নীতির তীব্র বিরোধিতা করছি। কোনও বামপন্থী কর্মী এই নীতি সমর্থন করতে পারেন না। হাবড়ায় বার খোলা হল কেন, এজন্য রাজ্য সরকার এবং বামফ্রন্ট পরিচালিত পৌরসভা — উভয়কেই জবাবদিহি করতে হবে।’’ অবিলম্বে এই বারের লাইসেন্স বাতিল করে জনসমক্ষে মিটিং করে পৌরসভাকে তা ঘোষণা করার দাবিও তিনি জানান। তিনি বলেন — অন্যথায় বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে। সভাপতি পরিতোষ সরকার উজ্জীবিত কণ্ঠে বলেন, অতীতে হাবড়াবাসী অনেক আন্দোলন করেছে। এই বার বন্ধের আন্দোলনেও হাবড়াবাসী জয়ী হবে।

এই কনভেনশন এলাকার সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে গভীর উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছে।

ধর্মঘট হলেই ‘গেল গেল’ রব

একের পাতার পর

কর্মসংস্থান হওয়া তো দূরের কথা, বাতিল করে দেওয়া হচ্ছে লক্ষ লক্ষ পদ। কম বেতনে কাজ করানো, ঠিকা প্রথায় শ্রমিক নিয়োগ, যেমন খুশি ছাঁটাই করার ক্ষেত্রে এখন মালিকদের অবাধ স্বাধীনতা। পেনশনের সুযোগ ক্রমেই কমে আসছে। কারখানা মালিক বিনা বাধায় কর্মচারীদের পি-এফ এর টাকা আত্মসাৎ করে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শ্রমিকের টাকা মেরে দেওয়া এইসব মালিকের বিরুদ্ধে কেন্দ্র বা রাজ্য কোন সরকারই কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না শুধু নয়, এসবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ যেটুকু গড়ে উঠছে তা গোড়াতেই পিষে মারতে শ্রমজীবী মানুষের কাছ থেকে মিটিং-মিছিল-আন্দোলন-বন্ধ করার অধিকারগুলি রাষ্ট্রশক্তি আজ একের পর এক ছিনিয়ে নিচ্ছে। ২০০ মানুষের কাজ চলে যাবার দুঃখে যারা কেঁদে ভাসাচ্ছে, শ্রমিকশ্রেণীর ওপর এই সার্বিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাদের কিন্তু টুঁ শব্দটি করতে দেখা যায় না।

শ্রমিক-কর্মচারীদের ওপর ক্রমাগত বেড়ে চলা এই আক্রমণ রুখতেই ২৪ ফেব্রুয়ারি সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল বামপন্থী কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলি। অথচ এ রাজ্যে বিনিয়োগ না হবার কারণ হিসাবে এই বন্ধ-আন্দোলনকেই দায়ী করছে পুঁজিপতিপোষ্য এইসব প্রচারমাধ্যম। মানুষের প্রতিবাদী কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দেবার আকুল প্রচেষ্টায় তারা ভুলিয়ে দিতে চায়, স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে শ্রমিক আন্দোলনে পশ্চিমবঙ্গ যখন উত্তাল, কলকাতা যখন তৎকালীন কংগ্রেসী প্রধানমন্ত্রীর চোখে ‘দুঃস্বপ্নের নগরী’, তখন কিন্তু আন্দোলনের কারণে এ রাজ্যে বিনিয়োগে ভাটা পড়েনি। আসলে শিল্পমালিক বিনিয়োগ করে তখনই যখন বিনিয়োগের অপরিহার্য শর্ত হিসাবে সেই পণ্য বিক্রির বাজার থাকে, যাতে উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করে সহজেই সে মুনাফা লুটতে পারে এবং করে সেখানেই যেখানে সে তার শিল্পের প্রয়োজনীয় উপকরণ এবং পরিকাঠামোর সন্ধান পায়।

আজকে বিশ্বজুড়ে চলছে পুঁজিবাদের তীব্র বাজার সঙ্কট। পুঁজিবাদী মন্দার এই দুর্দিনে শুধু পশ্চিমবঙ্গ কেন, সারা পৃথিবীতেই বিনিয়োগের হার হ্রাস পেয়েছে। পুঁজিবাদের এই মরণোন্মুখ চেহারাকে আড়াল করতেই ধামাধরা প্রচারমাধ্যমগুলি বন্ধ-আন্দোলনের বিরুদ্ধে তোপ দাগছে। তাই আজ যখন হাজার হাজার কোটি টাকার পুঁজি নতুন নতুন শিল্পে বিনিয়োগের পথ না পেয়ে ফাটকাবাজারে খাটছে, তখন মাত্র ৪৫ কোটি টাকার বিনিয়োগ না হওয়ায় হাহাকার করে মরছে সংবাদপত্র ও টিভি চ্যানেলগুলি। আসলে তাদের হাহাকার এই ৪৫ কোটি টাকা বিনিয়োগ না হওয়ার জন্য নয়। এই হাহাকার হচ্ছে এটাকে উপলক্ষ্য করে পুঁজিপতি-মালিকদের স্বার্থে জনমনে আন্দোলন-ধর্মঘট বিরোধী তীব্র মানসিকতা সৃষ্টি করার জন্য। অবশ্য এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কারণ এইটাই ওদের শ্রেণীচরিত্র। পুঁজিবাদের নিষ্ঠুর আক্রমণে যে সব খেটে খাওয়া মানুষ অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করছেন, আমরা আশা করব সংবাদমাধ্যমের এই অপপ্রচারে তাঁরা বিভ্রান্ত হবেন না।

এই প্রসঙ্গে আন্দোলনের স্বার্থেই আর একটি বিষয় আলোচনা করা দরকার বলে আমরা মনে করি। নাহলে যত আন্তরিকতাই থাকুক, মালিকশ্রেণীর তীব্র ও নির্মম আক্রমণের বিরুদ্ধে উপযুক্ত শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আমাদের দুর্বলতা থেকে যাবে। আমরা মনে করি মতাদর্শগত সংগ্রাম ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের একটা অন্যতম শর্ত। ফলে আমাদের এই আলোচনা আন্দোলনের স্বার্থে বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনা হিসাবে নিতে আমরা অনুরোধ করব। সকলেই জানেন যে, যে সমস্ত কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ২৪ তারিখের ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল তাদের অন্যতম হল সিটু। এ কথাও সকলেরই জানা যে, এই শ্রমিক সংগঠনটি যে রাজনৈতিক দলের মতাদর্শ অনুযায়ী পরিচালিত হয় সেই সি পি আই (এম)-এর নেতা-মন্ত্রীদের মুখে ইদানীং প্রায়শই জঙ্গি আন্দোলনের বিরুদ্ধে তীব্র হুঙ্কার শোনা যাচ্ছে। বেআইনি ছাঁটাই, লক-আউট, পি এফের কোটি কোটি টাকা মেরে দেওয়া সহ পুঁজি-মালিকদের ‘সাত খুন মাপ’ করে দিয়ে সি পি এম নেতৃত্ব, অহরহ শ্রমিকদের উৎপাদনের ক্ষেত্রে আরো ‘দায়িত্বশীল’ হবার উপদেশ দিয়ে যাচ্ছেন। তাঁদের মনোগত বাসনা হল — কারখানা-মালিক যাই করুক না কেন, শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রতিবাদ করা চলবে না। এমনকি ‘বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল’ তৈরি করে সেখানে প্রতিবাদী মিছিল, আন্দোলন, ধর্মঘট নিষিদ্ধ করার ‘একুশে আইন’ তৈরি করতেও তাঁরা পিছ-পা হননি। এ ঘটনা শুধু আজকের নয়, এ রাজ্যে সি পি এম দলটির গত ২৬ বছরের ক্ষমতায় থাকার ইতিহাসই হল মালিক-তোষণ ও শ্রমিক-পীড়নের ইতিহাস। তাঁদের ভেবে দেখা দরকার, তাঁরা যদি তাঁদের এই নীতির পরিবর্তন না করেন তাহলে যে আন্দোলনই একমাত্র শ্রমিকদের বাঁচার পথ, সেই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্রতি শ্রমিকদের বিশ্বাসযোগ্যতাই শুধু বাধাপ্রাপ্ত হবে না, অত্যাচারী মালিকশ্রেণী ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি এর পূর্ণ সুযোগ নেবে।

একথা কোনমতেই অস্বীকার করার উপায় নেই যে, তাঁদের দলের একটা বেশ ভাল অংশ আজ সুবিধাভোগী শ্রেণীতে পর্যবসিত হয়ে মালিকদের দালালি করলেও তাঁদের দলের অধিকাংশ কর্মী-সমর্থক-দরদী সহ বৃহৎ অংশের শ্রমজীবী মানুষই আজ ভয়ঙ্কর সঙ্কটের মুখোমুখি। মুমূর্ষু পুঁজিবাদের নির্মম দাঁত-নখে ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যাচ্ছে এইসব শ্রমজীবী মানুষের জীবন। এই নির্মম আক্রমণের হাত থেকে বাঁচতে তাঁরাও মনেপ্রাণে শক্তিশালী আন্দোলন চান। তাদের স্বার্থরক্ষার কথাটা যদি একটা কথার কথা না হয়, যদি সত্যিই সি পি এম নেতৃত্ব তা রক্ষা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন তাহলে লাগাতার জঙ্গি আন্দোলনের পথে তাদের আসতে হবে। আর যদি তা না করেন, তাহলে এ সন্দেহ থেকেই যাবে যে, এই বৃহৎ অংশের শ্রমজীবী মানুষের সামনে নিজেদের জঙ্গি ভাবমূর্তিটা মাঝে মাঝে ঘষেমেজে হাজির করার জন্যই শ্রমিকদরদী সেজে হঠাৎ হঠাৎ তাঁরা বনধের ডাক দেন — যেন শ্রমিকের স্বার্থরক্ষায় তাঁরা কতই না সচেষ্ট। এই সন্দেহ আরও দৃঢ় হয় যখন দেখা যায়, তাঁদের এই সব বনধের আগে অথবা পরে লাগাতার আন্দোলনের কোনো কর্মসূচি থাকে না। শ্রমজীবী মানুষের প্রতি আন্তরিক দরদবোধ থাকলে তাঁরা বুঝতেন, একদিনের একটা ধর্মঘটের দ্বারা এই নিদারুণ অত্যাচারের হাত থেকে তাদের রক্ষা করা যাবেনা; তার জন্য চাই সুনির্দিষ্ট কর্মসূচির ভিত্তিতে লাগাতার ঐক্যবদ্ধ জঙ্গি শ্রমিক আন্দোলন। কিন্তু তার ধারে কাছে না গিয়ে

আটের পাতায় দেখুন

মানবতাবাদীরাও স্ট্যালিনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন

স্ট্যালিন স্মরণসভায় কমরেড প্রভাস ঘোষ

৫ মার্চ স্ট্যালিন স্মরণ দিবসে কলকাতায় সভার মঞ্চে (বাঁ দিক থেকে) কমরেডস্ অনিল সেন, অসিত ভট্টাচার্য, সুকোমল দাশগুপ্ত এবং মানিক মুখার্জী। (ইনসেটে) বক্তব্য রাখছেন কমরেড প্রভাস ঘোষ।

"মার্কসবাদ বিজ্ঞান, এর ধ্বংস নেই। রুশ বিপ্লব হওয়া না-হওয়া, তার টিকে থাকা না-থাকার ওপর মার্কসবাদ নির্ভরশীল নয়। ফলে, সোভিয়েট ইউনিয়নের পতনের দ্বারা প্রমাণ হয় না যে মার্কসবাদ ব্যর্থ। সমাজতন্ত্রকে কোনভাবেই ইতিহাস থেকে মোছা যাবে না।" ৫ মার্চ কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলের একটি সভায় একথাগুলি বলেন প্রধান বক্তা, এস ইউ সি আই কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ। বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা কমরেড স্ট্যালিনের ৫১তম মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে দলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি এই সভা আহ্বান করেছিল। সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় স্টাফ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড মানিক মুখার্জী। উপস্থিত ছিলেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির তিন সদস্য কমরেডস অনিল সেন, সুকোমল দাশগুপ্ত ও অসিত ভট্টাচার্য।

কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, আজ এই সভায় যাঁরা বয়স্ক মানুষ আছেন, তাঁদের স্মরণে আছে ১৯৫৩ সালের ৫ মার্চ দিনটির কথা। স্ট্যালিনের মৃত্যুসংবাদে রাশিয়া, চীন, পূর্ব ইউরোপ, ল্যাটিন আমেরিকাসহ বিশ্বের সর্বত্র দেখা গিয়েছিল মানুষের শোকোচ্ছ্বাস। কলকাতায় যে শোকমিছিল হয়েছিল, অতীতে তেমনটি হয়নি। কীসের ভিত্তিতে স্ট্যালিন এই শ্রদ্ধার জায়গায় আসতে পেরেছিলেন ? শুধু কমিউনিস্টরাই নয়, মানবতাবাদীরাও স্ট্যালিনকে শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন। রাশিয়ায় গিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন — আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থস্থানে এলাম। রমাঁ রলাঁ বলেছিলেন, স্ট্যালিন পরিচালিত সমাজতন্ত্র দেখে আমি জীবন সায়াহ্নে প্রেরণা পেয়েছি। বার্নার্ড শ, যিনি রাজনীতি সম্পর্কেই হতাশ হয়ে পড়েছিলেন, তিনি তাঁর বন্ধুকে বলেছেন, গণতন্ত্র যদি দেখতে চাও, রাশিয়ায় যাও। এইচ জি ওয়েলস্ আর একজন প্রখ্যাত ব্যক্তি। ট্রটস্কির বক্তব্য থেকে তাঁর ধারণা হয়েছিল স্ট্যালিন একজন স্বৈরাচারী, রাশিয়ার মানুষ তাঁকে শ্রদ্ধায় নয়, ভয়ে মেনে চলে। স্ট্যালিনের সাথে সাক্ষাৎ করার পর তিনি বললেন, আমার ধারণা ভুল ছিল। স্ট্যালিনের মত মানুষ বিরল। সুভাষ বসু বলেছিলেন, এখনও দুনিয়ার ভরসা আছে, কারণ, স্ট্যালিন বেঁচে আছেন। কেন এঁরা এত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন স্ট্যালিনের প্রতি ?

জার্মানির এক সাংবাদিককে দেওয়া সাক্ষাৎকারে স্ট্যালিন বলেছেন — আমার প্রতিটি কাজ ও পদক্ষেপ বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বার্থে হচ্ছে কিনা, এটাই আমার একমাত্র বিচার্য। আমি লেনিনের ছাত্র, যাতে আরও যোগ্য ছাত্র হতে পারি, সেটাই আমার চেষ্টা।

প্রভাস ঘোষ বলেন, স্ট্যালিন যখন রাশিয়ান সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক লেবার পার্টির সঙ্গে যুক্ত হন, তখন মার্কসবাদের সঠিক উপলব্ধি নিয়ে রাশিয়ায় প্রবল বিতর্ক চলছিল। সে সময় লেনিনের ব্যাখ্যার পাশে দাঁড়ান স্ট্যালিন। পরে লেনিনের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয় এবং তারপর আজীবন তিনি লেনিনের যোগ্যতম ছাত্রের ভূমিকা পালন করে গিয়েছেন। বিপ্লবের পরেও পুঁজিপতিদের অস্তিত্ব ছিল রাশিয়ায়। দেশের ভিতরে ও বাইরে একটা সংকটময় পরিস্থিতিতে লেনিনের মৃত্যু হয়। তাঁর অনুপস্থিতিতে শূন্যতার সৃষ্টি হবে মনে করে প্রতিক্রিয়াশীলরা উল্লসিত হল। সে সময় স্ট্যালিন লেনিনের মরদেহকে সামনে রেখে, তাঁর স্বপ্ন পূরণ করার দায়িত্ব নিলেন, বিপ্লবের প্রতি পূর্ণ আনুগত্যের শপথ নিলেন। ১৯৫৩ সালে মৃত্যুর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত সেই দায়িত্ব তিনি পরম নিষ্ঠায় পালন করেছেন।

আমরা যে 'লেনিনবাদ' বলি, একথাটির সূচনাই করেছিলেন স্ট্যালিন। লেনিনের সকল রচনা ঘেঁটে, তার মূল নির্যাস তুলে ধরেছেন 'লেনিনবাদের সমস্যা' বইটিতে। তিনিই দেখিয়েছেন, লেনিনবাদই হচ্ছে 'বর্তমান সাম্রাজ্যবাদ ও সর্বহারা বিপ্লবের যুগের মার্কসবাদ'। ট্রটস্কি, বুখারিন, জিনোভিয়েভ, কামেনেভের দ্বারা বিকৃতির হাত থেকে লেনিনবাদকে রক্ষা করেছেন স্ট্যালিন। যেখানেই তিনি যেতেন লেনিনের ছবি সঙ্গে থাকতো, এখান থেকে তিনি প্রেরণা পেতেন। অথরিটিকে না মানলে কোনও চরিত্র গড়ে উঠতে পারে না — এই যে শিক্ষা কমরেড শিবদাস ঘোষ আমাদের দিয়েছেন, স্ট্যালিনের জীবন তার প্রমাণ।

তিনি বলেন, স্ট্যালিনের নেতৃত্বেই রাশিয়া একটি পশ্চাদপদ দেশ থেকে শিল্পোন্নত দেশে পরিণত হয়েছিল। প্রত্যেকের কাজের গ্যারান্টি ছিল, বিনা ব্যয়ে শিক্ষা-স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা ছিল। ১৯৩৬ সালে নতুন যে সংবিধান তৈরি হল, তা স্ট্যালিন সংবিধান নামেই পরিচিত। এই প্রথম দুনিয়ায় এল 'right to recall' — নির্বাচিত প্রতিনিধিকে প্রয়োজনে ফিরিয়ে আনার অধিকার, যেটা জনগণের থাকবে। রমাঁ রলাঁ বললেন, এই প্রথম সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা বাস্তবে রূপ পেল।

এরপর সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। ব্রিটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা ষড়যন্ত্র করেছিল জার্মানিকে দিয়ে সোভিয়েট ইউনিয়নকে ধ্বংস করার। গোটা বিশ্বের জনগণ তখন আশঙ্কিত, কীভাবে সোভিয়েট ইউনিয়নকে রক্ষা করা যায়। হিটলার যখন মস্কোর দোরগোড়ায়, সে সময় লালফৌজকে পরিচালনা করেছেন স্ট্যালিন। তাঁর নিরাপত্তার কথা ভেবে অনেকেই তাঁকে মস্কো ত্যাগ করার অনুরোধ করলেন, তিনি রাজি হননি। প্রতিটি সেনানীর কাছে তিনি ছিলেন অনুপ্রেরণা। লালফৌজ হিটলার বাহিনীকে পরাজিত করল। এজন্য সারা দুনিয়া স্ট্যালিনকে শ্রদ্ধা জানিয়েছে।

তিনি বলেন, লেনিন যে শিশু সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্ম দেন, তাকে যৌবনে পৌঁছে দিয়েছিলেন স্ট্যালিন। লেনিনের সৃষ্টি তৃতীয় আন্তর্জাতিককে রক্ষা করেছেন স্ট্যালিন। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে, যুদ্ধের বিরুদ্ধে, শান্তির সপক্ষে প্রতিটি আন্দোলনের সাথে স্ট্যালিনের নাম যুক্ত। এজন্যই প্রতিক্রিয়াশীলরা আতঙ্কের চোখে দেখেছে স্ট্যালিনকে। স্ট্যালিনের উজ্জ্বল ছবিকে কালিমালিপ্ত করতে না পারলে বিশ্বের বিপ্লবী আন্দোলনকে ঠেকানো যাবে না, একথা বুঝেই তারা স্ট্যালিনকে হেয় করার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়েছে, সহায়তা পেয়েছে শোধনবাদীদের কাছ থেকে।

কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন, স্ট্যালিনের বিরুদ্ধে ব্যক্তিপূজা চর্চার অভিযোগ মিথ্যা। আত্মপ্রচারকে ঘৃণা করতেন তিনি। কর্মীদের চেতনার মান নীচু থাকার জন্য স্ট্যালিনের প্রতি শ্রদ্ধা ব্যক্তিপূজায় পর্যবসিত হয়েছিল, স্ট্যালিন তা চাননি।

১৯৫৬ সালে সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতি কংগ্রেসে শোধনবাদী ক্রুশ্চেভ নেতৃত্ব যখন ব্যক্তিপূজাবাদ দূর করার নামে স্ট্যালিনবিরোধী কুৎসা শুরু করল, তখনই কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন, এ ঘটনা ভবিষ্যতের বিপদসঙ্কেত। স্ট্যালিনের নেতৃত্বকে খাটো করার দ্বারা সাম্যবাদী আন্দোলনে অথরিটিকেই অস্বীকার করা হবে, যা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের নামে যাবতীয় সংশোধনবাদী ও বিকৃত ধ্যানধারণা অনুপ্রবেশের দরজা খুলে দেবে। বাস্তবেও ঘটেছে ঠিক সেটাই।

মৃত্যুর কিছুদিন আগে ১৯তম পার্টি কংগ্রেসের জন্য যে রিপোর্টটি স্ট্যালিন তৈরি করেছিলেন, তাতে তাঁর গভীর উদ্বেগ প্রকাশ পেয়েছে। সেখানে তিনি বলেছেন, আদর্শগত চর্চা না হলে দল ও বিপ্লবের অপূরণীয় ক্ষতি হবে। বলেছেন, যুদ্ধের সময় আদর্শগত চর্চা কমে গিয়েছিল, ফলে ক্ষতি হয়েছে। আমাদের নেতা-কর্মীদের মধ্যে আত্মম্ভরিতা এসেছে, আর একদল নেতা হয়েছে বুরোক্র্যাট। এঁরা সমালোচনার গলা টিপে ধরেন। কিছু নেতা মনে করেন তাঁরা দলের শৃঙ্খলার উর্ধ্বে। কর্মী নির্বাচন করার ক্ষেত্রেও তাঁদের ব্যক্তিগত ঝোঁক কাজ করছে। Private property mentality and morality — এ বড় ক্ষতিকর জিনিস। অভ্যাসের মধ্যে থেকে গিয়ে তা ধীরে ধীরে শক্তি সংগ্রহ করে। বলেছেন, বিজ্ঞানের নানা ক্ষেত্রে যেখানে এখনও পার্টির কোন গাইডলাইন নেই, লেনিনবাদবিরোধী শক্তি সেখানে বাসা বাঁধছে।

এত বড় বিজয়ের পরেও জীবন সায়াহ্নে এসে স্ট্যালিন এগুলি ধরতে পেরেছিলেন। ১৯তম কংগ্রেসের পরে আদর্শগত লড়াই শুরু করার কথা ভাবছিলেন স্ট্যালিন, কিন্তু তিনি মারা গেলেন। এরপর ক্ষমতায় আসতে শুরু করল সংশোধনবাদীরা। তবুও ১৯৫৩ থেকে ১৯৯১ — এই দীর্ঘসময় লেগেছে সমাজতন্ত্র ভাঙতে। মুখে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-সমাজতন্ত্র জিন্দাবাদ বলতে বলতেই এই ক্ষতিটা তারা করল। কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছিলেন, জনগণের চেতনার মান এত নীচু ছিল যে সংশোধনবাদীদের শয়তানি তারা ধরতে পারেনি। নেতৃত্ব সম্পর্কে অন্ধতাও এক্ষেত্রে ভয়ঙ্কর ক্ষতি করেছে।

তিনি বলেন, মার্কসবাদ বিজ্ঞান — এর ধ্বংস নেই। মার্কসবাদকে অস্বীকার করা মানে বিজ্ঞানকে অস্বীকার করা। মার্কসবাদকে অস্বীকার করা মানে আজকের এই সার্বিক সঙ্কটকে চিরস্থায়ী বলে মেনে নেওয়া। নবজাগরণ থেকে ইউরোপে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পূর্ণ হতে সময় লেগেছে ৪০০ বছর। কিন্তু শোষণের অবসান হয়নি। সমাজতন্ত্র মানে হাজার হাজার বছর ধরে জমা হওয়া শোষণের ইতিহাসকে পাল্টে দেওয়া।

ফলে, সমাজতন্ত্রের পূর্ণ বিজয়ের জন্য সময় তো লাগবেই। ব্যর্থতার মধ্য দিয়েই আসবে বিজয়। শ্রমিকশ্রেণী বিপ্লব করবেই, করতে তাকে হবেই। সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের পতনের ১০ বছরের মধ্যেই বিশ্বের দেশে দেশে শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনের ঢেউ ফেটে পড়ছে। স্লোগান উঠছে — 'সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদ নিপাত যাক।' এরপর বিকল্প কী? সমাজতন্ত্রই একমাত্র বিকল্প, ফলে এরপর আওয়াজ উঠবে — সমাজতন্ত্র চাই, সেজন্য মার্কসবাদ-লেনিনবাদ চাই। রাশিয়ার মানুষও আজ বুঝতে পারছে — কী তারা হারিয়েছে। সেখানেও তাই মানুষ আবার লেনিন-স্ট্যালিনের ছবি নিয়ে পথে নামছে। আমাদের এই ভারতবর্ষেও বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে আমাদেরই। সেজন্য মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-স্ট্যালিন-মাও সে তুঙের শিক্ষা যেমন জানতে হবে, তেমনই তাদের শিক্ষাকে এদেশের মাটিতে বিশেষরূপে প্রয়োগ করে ভারতের বিপ্লবের যে সামগ্রিক গাইড লাইন দিয়ে গিয়েছেন কমরেড শিবদাস ঘোষ, তাকেও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানতে ও বুঝতে হবে। কমরেড শিবদাস ঘোষের বক্তব্য আজ বিশ্বের দেশে দেশে কমিউনিস্টদের মধ্যে সমাদৃত হচ্ছে। দেশের মধ্যে দল যত শক্তিশালী হবে, আন্তর্জাতিক বিপ্লবে তত আমরা সাহায্য করতে পারব। স্ট্যালিনের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার মধ্য দিয়ে সেই শপথই আমাদের নেওয়া দরকার।

সভাপতির ভাষণে কমরেড মানিক মুখার্জী বলেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্র একদিনে ধ্বংস হয়নি, শোধনবাদ ধীরে ধীরে বিস্তৃত হতে হতে একদিন প্রতিবিপ্লবের রূপ পেল। আমাদের মহান নেতা কমরেড

সাতের পাতায় দেখুন

লকআপে বন্দীর মৃত্যু

শিলিগুড়িতে বিক্ষোভ

সম্প্রতি দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি মহকুমার ফাঁসিদেওয়া থানা লক-আপে কমল শর্মার মৃত্যু ঘটে। সিমেন্ট কোম্পানির নৈশপ্রহরী কমল শর্মার মৃত্যুর কারণ হিসাবে এলাকার মানুষ সিমেন্ট ব্যবসায়ী ও পুলিশের যৌথ ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে আওয়াজ তুলেছেন। পুলিশ এই ঘটনাকে আত্মহত্যা বলে চালানোর চেষ্টা করছে। গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করলে যে সমস্ত লক্ষণ দেখা যায় তার কোনটাই না থাকায়, এলাকার সাধারণ মানুষের বিশ্বাস, কমল শর্মার উপর নির্মম, নৃশংস, অমানবিক পুলিশি অত্যাচারের ফলেই তার মৃত্যু ঘটে।

এই পরিস্থিতিতে যথার্থ ঘটনা জনগণের কাছে প্রকাশের উদ্দেশ্যে ও থানা লক-আপে কমলের অস্বাভাবিক মৃত্যুর প্রতিবাদে গত ২৬-২-০৪ তারিখে এস ইউ সি আই এবং সি পি আই (এম-এল) এর যৌথ উদ্যোগে এ ডি এম-এর নিকট গণডেপুটেশন দেওয়া হয়।

এস ইউ সি আই এবং সি পি আই (এম-এল)-এর পক্ষ থেকে দাবি করা হয় — (১) ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত করতে হবে, (২) দোষী পুলিশকে শাস্তি দিতে হবে, (৩) মৃতের পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

ঋণের দায়ে বিজেপি বেচছে দেশ, সি পি এম বেচছে রাজ্য

১৯৬৮ সালে বিশ্বব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান ম্যাকনামারাকে কালো পতাকা দেখিয়ে ফিরে যেতে বাধ্য করেছিল পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী দলগুলি ও মেহনতি মানুষ। সেদিনের আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত সি পি এম নেতারা এখন গদীতে বসে পর্দার আড়ালে বিশ্বব্যাঙ্কের ভজনা করছেন।

১৯৯৩ সালে বিশ্বব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান লুই প্রেস্টনের সঙ্গে বৈঠকে বসেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। চেয়ারম্যানকে যারা কালো পতাকা দেখিয়েছিল, পুলিশ পাঠিয়ে সি পি এম নেতারা তাদের পেটায়।

বিশ্বব্যাঙ্কের ঋণ রাজ্য সরকার নিচ্ছে দু'হাতে। '৯৮ সাল পর্যন্ত বিশ্বব্যাঙ্ক ও অর্থলগ্নী সংস্থা থেকে নেওয়া ঋণের পরিমাণ ছিল ৯,৫০০ কোটি টাকা। '৯৮ সালে কয়েকটি নির্দিষ্ট প্রকল্পের জন্যই নেওয়া হয় ১,১১৬ কোটি টাকা।

ফারাক্কা থার্মাল পাওয়ার, কলকাতা নগর উন্নয়ন, পশ্চিমবঙ্গ কৃষি গবেষণা, সামাজিক বনসৃজন প্রভৃতি খাতে '৯২ সাল পর্যন্ত দফায় দফায় গৃহীত ঋণ হল ৮৮ কোটি ১০ লক্ষ মার্কিন ডলার (প্রায় ৪০ হাজার কোটি টাকা)

অতি সম্প্রতি ৭০০ কোটি টাকা বিশ্বব্যাঙ্কের ঋণ এসেছে হাসপাতাল চালানোর (নাকি বেসরকারিকরণের) জন্য?

পথ, পরিবহন, নিকাশি, স্বাস্থ্য সর্বক্ষেত্রেই বিদেশি ঋণ নিচ্ছে সি পি এম ফ্রন্ট সরকার। ১৯৯১ সালে এজন্য ২০০ কোটি টাকা সুদ দিতে হয়েছিল।

বর্তমানে রাজ্য সরকারের দেশি-বিদেশি ঋণের পরিমাণ "বিশেষজ্ঞদের মতে ৭০,০০০ কোটি টাকার উপরে"। ২০০১-এ সি এ জি রিপোর্ট থেকে জানা যায়, '৯৬-২০০১ এই পাঁচ বছরে ধার বেড়েছে ৪৯৩ শতাংশ। ফলে বছরে সুদ গুণতে হয় ৭০০০ কোটি টাকার কাছাকাছি। সরকারের মোট রাজস্বের ৪০ শতাংশই চলে যায় সুদ বাবদ।

সি পি এম বলে, কেন্দ্র ঋণ নিয়ে দেশ বেচে দিচ্ছে। কথাটা ঠিকই, তবে পশ্চিমবঙ্গকে বিক্রি কি তারা নিজেরাই করছে না?

(বর্তমান ২২-১-২০০২, 'সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন ও পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের ভূমিকা' বই থেকে)

অভিযুক্ত মহিলাদের গ্রেপ্তার সম্পর্কে সুপ্রিম কোর্টের রায় বাতিল করার জন্য

রাষ্ট্রপতির কাছে এ আই এম এস এস-এর আবেদন

অভিযুক্ত মহিলাদের পুরুষ পুলিশ রাত্রেও গ্রেপ্তার করতে পারবে — সুপ্রিম কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের এই রায় সম্পর্কে ভারতের রাষ্ট্রপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের সভানেত্রী কমরেড ছায়া মুখার্জী ২৫ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রপতির উদ্দেশে এক চিঠি পাঠিয়েছেন।

চিঠিতে বলা হয়েছে — মুম্বই হাইকোর্ট এক রায়ে পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছিল — কোন অভিযুক্ত মহিলাকে সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত গ্রেপ্তার করা যাবে না এবং অন্য সময় গ্রেপ্তার করতে হলে মহিলা পুলিশ দিয়ে করতে হবে। মুম্বই হাইকোর্টের এই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ এক রায়ে পুলিশকে অধিকার দেয় — অভিযুক্ত মহিলাকে দিন রাত্রি যেকোন সময় পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পারবে। সেক্ষেত্রে মহিলা পুলিশের আবশ্যকতা নেই।

সুপ্রিম কোর্টের এই রায় বিশেষ করে নারীদের তো বটেই, সমাজের সর্বস্তরের মানুষকেই প্রবল আঘাত দিয়েছে।

এক মহিলা লক-আপে তাঁর স্বামীর মৃত্যু সম্পর্কে থানায় খোঁজ নিতে গেলে মহিলাকে বেআইনিভাবে থানায় আটকে রেখে তার শালীনতা হরণ করে পুলিশ। এই ঘটনার সূত্রেই মুম্বই হাইকোর্ট উপরোক্ত নির্দেশ দিয়েছিল। যে সময় মুম্বই হাইকোর্ট এই রায় দিয়েছিল, এখন সেই পরিবেশের এক ইঞ্চি উন্নতি তো হয়নি বরং বিভিন্ন রাজ্যের ঘটনাবলী প্রমাণ করে যে, পরিবেশ আরও অধঃপতিত হয়েছে।

কেবল দু-একটি ঘটনাই উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে ঐ চিঠিতে। যেমন কিছুদিন আগে এক ছাত্রীকে রাষ্ট্রপতি ভবনের এক নিরাপত্তারক্ষী ধর্ষণ করেছে। অন্ধ্রপ্রদেশের গুন্টুর জেলায় পুলিশ চিরুনি তল্লাশির সময় তিন আদিবাসী মহিলাকে গণধর্ষণ করেছে; কলকাতায় এক ফুটপাথবাসিনী মহিলাকে পুলিশ ব্যারাকে তুলে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ করেছে। খোদ দিল্লির বুকে এক বিদেশিনী কূটনীতিকের সম্ভ্রম রক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে বিশ্বের 'বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র' ভারতের স্বরাষ্ট্র দপ্তর।

উল্লিখিত ঘটনাগুলি থেকেই বোঝা যায় যে, সুপ্রিম কোর্টের এই ধরনের রায় অসঙ্গত, অযৌক্তিক ও অন্যায়ই কেবল নয়, তা মহিলাদের মর্যাদা, সম্ভ্রম ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে অত্যন্ত বিপজ্জনক। বলা বাহুল্য, সর্বোচ্চ আদালতের এই ধরনের রায় অবিলম্বে বাতিল করা দরকার। এ ব্যাপারে রাষ্ট্রপতিকে সত্বর উপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়ার জন্যই সমগ্র দেশের মহিলাদের পক্ষ নিয়ে এ আই এম এস এস আবেদন জানিয়েছে।

রাজ্যে বেকার আছে, কাজ নেই

২০০৩ সালের অক্টোবর মাসে পশ্চিমবঙ্গে নথিভুক্ত বেকার সংখ্যা হল ৬৬ লক্ষ ৬৭ হাজার। গত কয়েকবছর বেকার বাড়ছে বছরে গড়ে ৩ লক্ষ হারে।

১৯৯৯	—	৫৫,৫৫,৯৫২
২০০০	—	৫৮,৯৮,৯৪২
২০০১	—	৬১,৯০,০১০
২০০২	—	৬৩,৩০,০০০
২০০৩	—	৬৬,৬৭,০০০

এবার দেখা যাক, চাকরি কেমন হয়েছে নথিভুক্ত বেকারদের —

১৯৯৯	—	১৪,৪৬৫
২০০০	—	১৩,৭৫৮
২০০১	—	১১,১৫৭

অর্থাৎ, এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে নাম লেখায় না বেকার। সেখান থেকে চাকরি হয় না। বেকার ভাতাও মেলে না। তাই নাম লেখানোর তাগিদ নেই। কাজেই নথিভুক্ত বেকার সাড়ে ৬৬ লক্ষ হলেও বাস্তবে তা বহুগুণ বেশি। এদের ধোঁকা দিতেই এখন ভোটের আগে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের ফানুস ওড়ানো হয়েছে, যেমন একদিন হলদিয়া প্রকল্পের ফানুস ওড়ানো হয়েছিল। (তথ্যসূত্র ঃ বিভিন্ন বছরে রাজ্য শ্রমদপ্তরের রিপোর্ট)

গভীর আবেগ ও উদ্দীপনায় মেছেদায় বিদ্যাসাগর ভবন, গ্রন্থাগার ও গবেষণা কেন্দ্রের উদ্বোধন

ভারতের নবজাগরণের অন্যতম প্রাণপুরুষ, প্রাতঃস্মরণীয় মনীষী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নামে বিদ্যাসাগর ভবন, বিদ্যাসাগর গ্রন্থাগার ও গবেষণা কেন্দ্র উদ্বোধন হল ২৯ ফেব্রুয়ারি পূর্বমেদিনীপুর জেলার মেছেদার শান্তিপুর পল্লীতে। ঘোষণা মত ঠিক বেলা ২টায় বিদ্যাসাগর ভবন ও গ্রন্থাগারের দ্বার উন্মোচন করে ভবনের উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রকাশ্য সভা অনুষ্ঠিত হয় ভবনের সামনের মাঠে। জেলার শিক্ষক অধ্যাপক বুদ্ধিজীবীদের সাথে ছাত্র যুব ও সাধারণ মানুষ মিলিয়ে প্রায় দু'হাজার মানুষের সমাবেশ ঘটেছিল। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন বিদ্যাসাগর মেমোরিয়াল ট্রাস্টের সভানেত্রী মেদিনীপুর গোপ কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষা ডঃ সুশীলা মণ্ডল। সভায় বক্তব্য রাখেন ডঃ সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়, শিক্ষাবিদ অধ্যাপক সুনন্দ সান্যাল, সারা বাংলা বিদ্যাসাগর মৃত্যু শতবার্ষিকী কমিটির সম্পাদক মানিক মুখোপাধ্যায়, শিক্ষক নেতা তপন রায়চৌধুরী, স্থানীয় সাংসদ লক্ষ্মণ শেঠ ও বিধায়ক বিপ্লব রায়চৌধুরী।

ডঃ সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন, বিদ্যাসাগর একটি মানুষই ছিলেন, কী বৃটিশ ভারতে কী স্বাধীন ভারতে দ্বিতীয় কোন বিদ্যাসাগর জন্মান নি। সমাবেশে ৮০-৯০ বছরের বৃদ্ধ-বৃদ্ধার সাথে এ প্রজন্মের বহু ছাত্র যুবকদের উপস্থিতি এবং গভীর শ্রদ্ধায় ভরা আবেগে উজ্জ্বল মুখগুলি দেখে ডঃ মুখার্জী বলেন, এখনকার ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার আগ্রহ নেই, লাইব্রেরীতে যায় না, একথা ভেবে আমি হতাশ ছিলাম। আজ এই অনুষ্ঠানে এসে উৎসাহ পেয়েছি, আমার নিজের সংগ্রহে ২৫ হাজারের মত বই আছে, তা এই লাইব্রেরীতে দিয়ে দেব।

অধ্যাপক সুনন্দ সান্যাল বলেন — আমার মতে বিদ্যাসাগরের শ্রেষ্ঠ কীর্তি বাংলা ভাষার বিকাশ ঘটানোর এবং শিক্ষার প্রসারের ক্ষেত্রে। তিনিও তাঁর সংগৃহীত বই এই গ্রন্থাগারে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন।

মানিক মুখোপাধ্যায় বিদ্যাসাগরের সেক্যুলার মানবতাবাদী মহান চরিত্রের দিকটি তুলে ধরেন। আধুনিক মানুষ সৃষ্টি করার জন্য শিক্ষা বিস্তার, নারী শিক্ষা বিস্তার এবং শোষিত-নিপীড়িত মানুষের প্রতি তাঁর গভীর আবেগের দিকটিও তুলে ধরেন।

বিদ্যাসাগর মেমোরিয়াল ট্রাস্টের সম্পাদক মানব বেরা এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও ভবিষ্যত কর্মপন্থা ও গবেষণার বিষয় তুলে ধরে বলেন, জনগণের আর্থিক সাহায্যে এই প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে। এর সঙ্গে একটি অডিটোরিয়াম গড়ে তোলার পরিকল্পনা আছে। এর জন্য বিপুল অর্থের প্রয়োজন। জনগণের আর্থিক সাহায্যে এ হলটি গড়ে তোলা হবে। প্রয়াত অগ্নিযুগের বিপ্লবী বিমল দাশগুপ্ত এই ট্রাস্টের সভাপতি ছিলেন, প্রয়াত স্বাধীনতা সংগ্রামী গোপীনন্দন গোস্বামী এই ট্রাস্টের সহ-সভাপতি ছিলেন। তাঁদের স্বপ্নকে কিছুটা রূপ দিতে আমরা পেরেছি, এখনো অনেক কাজ বাকি। জনগণের সাহায্য ও সহযোগিতায় তা সম্পন্ন হবে। গবেষণা কেন্দ্রে বিদ্যাসাগর সম্পর্কে অনালোচিত দিকগুলি ও অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের অজ্ঞাত দিকগুলি নিয়ে গবেষণা ও বই প্রকাশ করা হবে।

নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি আরিস্তিদেকে দেশ ছাড়তে বাধ্য করা হল

(হাইতির নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি আরিস্তিদেকে শেষ পর্যন্ত দেশ ছাড়তে বাধ্য করেছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। মার্কিন অস্ত্র ও অর্থে পুষ্ট এক দালাল বাহিনীর নেতাকে সরকারে বসানো হয়েছে। শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার নামে এখন হাইতির রাস্তায় মার্কিন সেনা টহল দিচ্ছে।

মার্কিন সরকারের পূর্বতন অ্যাটর্নি জেনারেল র‍্যামসে ক্লার্ক ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকশন সেন্টার নামক আমেরিকায় অবস্থিত একটি সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা। এই সংগঠনের প্রতিনিধি হিসাবেই হিদার কোটিন জারভেসি গত নভেম্বর মাসে কলকাতায় অনুষ্ঠিত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী কনভেনশনে যোগ দেন।

হাইতির ঘটনা সম্পর্কে র‍্যামসে ক্লার্ক যে বিবৃতি দিয়েছেন, সেটি এখানে প্রকাশ করা হল।)

গত তিন বছর ধরে মার্কিন শাসকরা হাইতির প্রেসিডেন্ট জাঁ বার্ট্রান্ড আরিস্তিদেকে তার পদ থেকে সরাবার চেষ্টা করেছে। এর জন্য তারা সেদেশের ওপর একতরফা নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করেছে এবং পশ্চিম গোলার্ধের সবচেয়ে গরিব এই দেশের জন্য পাঠানো মানবিক সাহায্য আটকে দিয়েছে। তারা প্রেসিডেন্ট আরিস্তিদের প্রতি সমর্থন তুলে নিয়ে বিরোধীদের সমর্থন করেছে; আরিস্তিদিকে সরানোর জন্য লাগাতার প্রচার চালিয়েছে। হাইতির সংবিধান ও আইনকে লঙ্ঘন করে নির্বাচন করার দাবিকে তারা মদত দিয়েছে।

অতি সম্প্রতি মার্কিন সরকার সশস্ত্র আক্রমণের দ্বারা সেদেশের সরকারের পতন ঘটিয়েছে। এর জন্য তারা হাইতির পূর্বতন মিলিটারি অফিসার, এফ আর এ পি এইচ বা ফ্রাফে'র কিছু নেতা, যারা বাস্তবে এক দঙ্গল অপরাধী ছাড়া কিছু নয়, তাদের সাহায্য করেছে। এরাই প্রচুর মারণাস্ত্র নিয়ে মার্কিন মদতে সেদেশে প্রবেশ করেছে। সংখ্যায় মাত্র কয়েকশ' হলেও এই ক্রিমিনাল গ্যাং খুব সহজেই হাইতির পুলিশদের হত্যা করে ক্যাম্প হাইতিয়েন, গোনাইভেস, হিঞ্চে এবং লে কেইস প্রভৃতি শহরাঞ্চল দখল করে নিয়েছে। ঐ সব পিস্তল-সম্বল পুলিশদের না ছিল যুদ্ধের, না ছিল কম্যান্ডোদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করার ট্রেনিং। এই ছোট খুনে বাহিনী হাইতিতে ঢুকতে পারত না, যদি শান্তিপ্রিয় প্রেসিডেন্ট আরিস্তিদে হাইতির সেনাবাহিনীকে ভেঙে না দিতেন। কাজটা প্রশংসার হলেও, দুর্ভাগ্যজনক। এর ফলে যে কোন সশস্ত্র আক্রমণের মুখে হাইতির আত্মরক্ষার কোন উপায় থাকেনি। গণতান্ত্রিক পথে নির্বাচিত হাইতির সরকারকে রক্ষা করার জন্য ক্যারিবিয়ান কমন মার্কেট, অর্গানাইজেশন অব আমেরিকান স্টেটস (OAS) বা রাষ্ট্রসংঘের মতো আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলির সক্রিয় হওয়া উচিত ছিল। কোস্টারিকা যখন তার সৈন্যবাহিনী তুলে দিয়েছিল, তখন নিকারাগুয়ার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট সোমোজা দুবার কোস্টারিকা অভিযানের হুমকি দিয়েছিলেন — একবার ও এ এস এবং আর একবার ভেনেজুয়েলা হস্তক্ষেপ করার জন্যই কেবলমাত্র সোমোজার পক্ষে কোস্টারিকায় হানাদারি করা সম্ভব হয়নি। আমেরিকা ক্রমাগত চাপ দিয়েছে যাতে আরিস্তিদে তাঁর সাংবিধানিক দায়দায়িত্ব পরিত্যাগ করেন, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে অস্বীকার করেন এবং পুরনো শাসকদের দয়ার উপর জনগণকে ছেড়ে দিয়ে চলে যান। মার্কিন মদতে এবং সামরিক বাহিনী, আধা সামরিক 'ফ্রাফ' ও ক্রিমিনাল গ্যাঙগুলি এবং ধনকুবেরদের সাহায্যে পূর্বতন প্রেসিডেন্ট দুভালিয়ার হাইতির জনগণের বিরুদ্ধে ৩০ বছর ধরে সন্ত্রাস চালিয়েছিল। ১৯৮৬ সালে যখন বেবি ডক দুভালিয়রের অত্যাচারী বাহিনী জনগণের ক্রোধকে আর ঠেকিয়ে রাখতে পারল না, তখন দুভালিয়ার দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়। মার্কিন বিমান বাহিনীর একটি বিমানেই তাকে ফরাসি রিভিয়েরাতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, সঙ্গে ছিল হাইতির গরিব মানুষের রক্ত মোক্ষণ করা লাখ লাখ ডলারের ভাণ্ডার।

বুশ প্রশাসনের প্রচণ্ড চাপ সত্ত্বেও প্রেসিডেন্ট আরিস্তিদে বরাবরই তার দেশের জনগণকে ছেড়ে যেতে, হাইতির গণতন্ত্র ও সংবিধানসম্মত সরকারের ক্ষতি করতে ও পদত্যাগ করতে অস্বীকার করেছেন। ১৯৯১ সালে যখন তিনি হাইতির প্রথম গণতান্ত্রিক পথে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি হিসাবে কার্যভার গ্রহণ করেন তখন তাকে সরাবার জন্য যে ধরনের সশস্ত্র আক্রমণ করা হয়েছিল, আজ আবার তাকে সেই ধরনের প্রচণ্ড চাপের মুখে পড়তে হয়েছিল।

হাইতি হচ্ছে একমাত্র দেশ যেখানে এক সফল দাসবিদ্রোহ ঘটেছিল। ১৭৯১ সালে টুসেঁ লুভের্তিয়রের নেতৃত্বে এই বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল। এবং ১৮০৪ সালে জাঁ জাক দেসালিনে ও অন্যান্যদের নেতৃত্বে নেপোলিয়নের ২০০০০ সৈন্যের বাহিনীকে পরাস্ত করে স্বাধীনতা অর্জনের মধ্যে দিয়ে শেষ হয়েছিল। নির্বাসিত অবস্থায় আরিস্তিদের যে আত্মজীবনী ১৯৯২ সালে ফ্রান্স থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়, তাতে আরিস্তিদে লেখেন, "হাইতিতে আমরা এক বিদ্রোহী জনগণের উত্থান দেখতে পাচ্ছি, এরা দাসপ্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করছে। আমি কেবল তাদের এই আন্দোলনকে প্রতিধ্বনিত ও প্রতিফলিত করছি। তারাই প্রধান কুশীলব। আমি তাদের মধ্যে থাকতে চেষ্টা করেছি। তাদের দেখাতে চেয়েছি যে, জীবনের সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যে ভালবাসা ও অহিংসাই হল একমাত্র বিষয় যা আমাদের এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে।"

প্রেসিডেন্ট আরিস্তিদে তাঁর আত্মজীবনীর শেষ পরিচ্ছেদে 'হাইতির গণতন্ত্রের দশটি নির্দেশাবলী'র উল্লেখ করেন। ১৯৯১ সালের সেপ্টেম্বরে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের ভাষণে তিনি এগুলির কথা বলেছিলেন। এর মধ্যে রয়েছে, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, মানবিক অধিকারের প্রতি অঙ্গীকার, খেতে পাওয়ার ও কাজের অধিকার,

ছয়ের পাতায় দেখুন

হাইতির রাস্তায় মার্কিন সেনা

ঘেরাও ঃ বেলজিয়ামেও

ব্রাসেলসের ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট এরিয়ায় একটি রঙের কারখানা 'সিগমা কোটিংস'-এর কর্তৃপক্ষ প্রায় তিন-চতুর্থাংশ শ্রমিককে ১ জানুয়ারি ২০০৪ থেকে ছাঁটাই করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। তার বিরুদ্ধে শ্রমিকরা আন্দোলনে নামে ও 'সিগমা কোটিংস'এর ছয়জন ডিরেক্টরকে প্রায় তিন দিন টানা ঘেরাও করে রাখে।

সংবাদে প্রকাশ, ২৫ নভেম্বর বিক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ শ্রমিকেরা কারখানা দখল করে নেয়। অসামরিক নিরাপত্তা দপ্তরে খবর যায়, ছয়জন পরিচালককে পণবন্দী করে রাখা হয়েছে। পুলিশি তৎপরতা শ্রমিকদের মনোবল ভাঙতে পারেনি। পুলিশ এসে দেখে যে, ঘেরাও হওয়া ডিরেক্টরদের অভ্যস্ত জীবনযাত্রায় কোনও ব্যাঘাত ঘটানো হয়নি। প্রশ্নের উত্তরে একজন শ্রমিক জানায়, তারা কর্তৃপক্ষকে ছাঁটাই করার পরিণতি নিয়ে ভাবতে বাধ্য করেছে। শ্রমিকরা নিরস্ত্র দেখে পুলিশ ফিরে যায়। এরপর ২৭ ডিসেম্বর, ২০০৩ রাতে কর্তৃপক্ষ ছাঁটাইয়ের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারে বাধ্য হয়। পশ্চিমবঙ্গে অনেকে বলেন, শিল্পোন্নত দেশগুলিতে শ্রমিক আন্দোলন হয় না, শ্রমিক আন্দোলনই শিল্পবিকাশের পথে বাধা। তাঁরা যে সত্য বলেন না, 'সিগমা কোটিংস'-এর আন্দোলন সেটাই প্রমাণ করল। সর্বোপরি, 'ঘেরাও' যে গণতান্ত্রিক শ্রমিক আন্দোলনেরই একটি অঙ্গ বেলজিয়ামের শ্রমিকরা সেটাও প্রমাণ করল। পুঁজিবাদ যতদিন থাকবে, আন্দোলনও থাকবে। (সূত্রঃ 'সলিডেয়ার', (ব্রাসেলস্) ৩.১২.২০০৩)

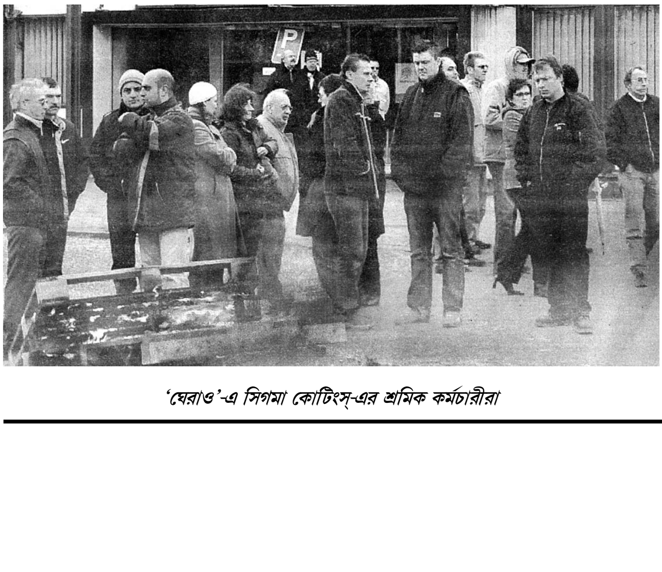

'ঘেরাও'-এ সিগমা কোটিংস্-এর শ্রমিক কর্মচারীরা

মার্কিন কৃষি পণ্য আমদানি বন্ধের দাবিতে মেক্সিকোতে কৃষক আন্দোলন

আমেরিকা, কানাডা ও মেক্সিকোকে নিয়ে ১৯৯৪ সালে গঠিত NAFTA (North American Free Trade Area) প্রণীত ও গৃহীত বিভিন্ন আইনের সুযোগ নিয়ে ব্যাপক সরকারি ভরতুকির সুবিধাপ্রাপ্ত মার্কিন বহুজাতিক সংস্থাগুলির উৎপাদিত কৃষিপণ্য বন্যার জলের মতো মেক্সিকোতে ঢুকে পড়ে। মেক্সিকোর কৃষিপণ্যকে হটিয়ে বাজার দখল করার জন্য প্রায় ৪০ শতাংশ কম দামে মার্কিন কৃষি পণ্য বিক্রি করা হতো। এর ফলে সে দেশের ঋণগ্রস্ত, দরিদ্র বহু কৃষক ঋণশোধের আপ্রাণ চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছে। ২০০০ থেকে ২০০৩ সালের মধ্যে মেক্সিকোর ৪০ হাজার কৃষক আত্মহত্যা করেছে। একই কারণে মেক্সিকোতে কৃষিক্ষেত্রে ১৯৯৪ থেকে ২০০৩ সালের মধ্যে কর্মসংস্থান ৮১ লক্ষ থেকে কমে ৫০ লক্ষে দাঁড়িয়েছে। আমেরিকা থেকে ভরতুকি দেওয়া কৃষি পণ্য আমদানির বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য মেক্সিকোর ২৫টি কৃষক সংগঠন ও শ্রমিক সংগঠন ২০০৩ সালের ২ ফেব্রুয়ারি গঠন করেছে এক যৌথ সংগ্রামী মঞ্চ। এ বছরের ২ ফেব্রুয়ারি ছিল তার প্রথম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী। এ উপলক্ষে ঐদিন মেক্সিকো সিটিতে দশ লক্ষ মানুষের জমায়েতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আওয়াজ ওঠে। সেখানে ইরাক থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের দাবিও তোলা হয়েছে। (হিন্দু, ৩-২-০৪)

ইরানে পুলিশের গুলিতে চারজন ধর্মঘটি শ্রমিকের মৃত্যু

দক্ষিণ পূর্ব ইরানের কারম্যান প্রদেশের একটি তামার খনিতে স্থায়ী চাকরি ও মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে খনি শ্রমিকরা কয়েকদিন ধরে আন্দোলন চালাচ্ছিল। এ আন্দোলন ভাঙতে রাজধানী তেহেরান থেকে বিশেষ পুলিশ বাহিনী হাজির হয়। আন্দোলনরত খনি শ্রমিকদের লক্ষ্য করে পুলিশবাহিনী নির্বিচারে গুলি চালালে ঘটনাস্থলেই চারজন খনি শ্রমিকের মৃত্যু হয়।

(এ পি, ডেকান হেরাল্ড, ২৯-১-০৪)

দীঘা শঙ্করপুরসহ সমুদ্র উপকূলের মৎস্যজীবী ও ব্যাপক মানুষকে উচ্ছেদের ষড়যন্ত্র

ভারতবর্ষের নাগরিক হয়ে মৎস্যজীবী হিসাবে আমরা আজ অবস্থান করছি ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে সৃষ্ট ''দীঘা মোহনা'' নামক স্থানে। যার প্রকৃত অবস্থান ছিল বর্তমান সমুদ্র জলরাশির প্রায় দুই কিলোমিটার দক্ষিণে। প্রকৃতির নিয়মে সমুদ্র আজ চলে এসেছে নগর সভ্যতাকে গ্রাস করতে। মানুষ তার নিজের প্রয়োজনে কখনও কখনও বাধ্য হয় প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করতে। যেমন, জীবিকার তাগিদে লড়াই করে চলেছে কুড়ি হাজার মৎস্যজীবী। সমুদ্র চাইছে নগর সভ্যতার সৃষ্ট পর্যটন শহর দীঘাকে তার পাড় থেকে সরিয়ে দিতে। সমুদ্র প্রাকৃতিক নিয়মে ক্রমে এগিয়ে আসছে গরিব নিরন্ন কুড়ি হাজার মৎস্যজীবীসহ হাজার হাজার গ্রামবাসীকে উৎখাত করতে। এদের না আছে বিজ্ঞানসম্মত সহযোগিতা না আছে কোন সরকারি অর্থানুকূল্য। তাই তারা বাধ্য হচ্ছে সমুদ্রকে সাময়িকভাবে কিছু বালির বস্তা ফেলে বাধা দিতে।

কুড়ি হাজার মৎস্যজীবী-শিল্পীর সৃষ্টি এই দীঘা মোহনা আজ পশ্চিমবাংলার সর্ববৃহৎ মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র। পশ্চিমবঙ্গে এমন কোন শিল্পাঞ্চল নেই যা সরকারি বিপুল অর্থলগ্নী ছাড়া গড়ে উঠেছে। সাত হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগে কোন শিল্প হলে, সেখানে কর্মসংস্থান হয় মাত্র সাত শত লোকের। অথচ সরকারি সাহায্য ছাড়া মাত্র আঠারো একর জায়গার উপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে কুড়ি হাজার মানুষের প্রত্যক্ষ কর্মক্ষেত্র এই দীঘা মোহনা। আর পরোক্ষে হয়েছে লক্ষাধিক মানুষের কর্মসংস্থান। সরকারি সাহায্য বলতে চারশ' ফুট পিচরাস্তা, বিদ্যুৎ সংযোগ, পঞ্চাশটি ল্যাট্রিনযুক্ত বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট ও আংশিক পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা — সর্বসাকুল্যে যার আর্থিক পরিমাণ প্রায় তেইশ লক্ষ টাকা।

এছাড়া যা কিছু রয়েছে সবই মৎস্যজীবীদের কষ্টার্জিত, তাদের পরিশ্রমের ফল। শুধু দীঘায় মৎস্যজীবীদের বাৎসরিক লেনদেন হয় ১৫০ কোটি টাকারও বেশি। এই দীঘা মোহনা মৎস্য অবতরণকেন্দ্র প্রতি বছর বিদেশে মাছ রপ্তানি করে সরকারি কোষাগারে প্রায় আশি কোটি টাকা এনে দেয়। তবুও সর্বাপেক্ষা অবহেলিত-উপেক্ষিত এই দীঘা মোহনা মৎস্য অবতরণকেন্দ্র ও তার নিরন্ন মৎস্যজীবীরা।

চারিদিকে আজ চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র — মৎস্যজীবীদের ব্যবসাবাণিজ্যের এলাকা থেকে সরে যেতে হবে। সম্প্রতি দীঘা-শঙ্করপুর উন্নয়ন পর্ষদ একটি সরকারি বিজ্ঞপ্তি পেশ করেছেন। যেখানে বলা হয়েছে সমুদ্র তীরে বসবাসকারী মৎস্যজীবীরা সমুদ্রের বালুচর ক্ষয়ের জন্য দায়ী। তাদের স্থানান্তরিত করে সমুদ্রের জলকে অবাধে বিচরণের সুযোগ করে দিতে হবে। এছাড়া সমুদ্রের আগ্রাসন বন্ধ করার অন্য কোন বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি নাকি নেই। এটা বিজ্ঞানসম্মত বাস্তব না নিরন্ন মৎস্যজীবী ও কয়েক হাজার দরিদ্র শ্রমিককে কর্মহীন করে তাদের রুজি রোজগার বন্ধ করে স্থানীয় অর্থনীতি নির্ভর শিল্পকে ধ্বংস করার সুপরিকল্পিত চক্রান্ত ?

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৭৫ সালেও জরুরি অবস্থার সময় দীঘা উন্নয়ন পর্ষদ ১নং স্নানের ঘাটে মৎস্যজীবীদের দীর্ঘদিনের কর্মস্থল তুলে দিয়ে হাসপাতাল ঘাটে পাঠিয়ে দেয়। মানবজাতি তার জীবন-জীবিকার স্বার্থে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে প্রকৃতির সাথে লড়াই করে বেঁচে থাকার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করছে। তাই শাসকশ্রেণীর কাছে প্রশ্ন — বর্তমান দীঘাকে সুরক্ষিত রাখার জন্য প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে যেভাবে পর্যটন কেন্দ্রটিকে সুরক্ষিত করা হয়েছে, সেই প্রযুক্তি দিয়ে কুড়ি হাজার মানুষের কর্মক্ষেত্র ও হাজার হাজার গ্রামবাসীকে রক্ষা করা যায় না কি? একদা সমুদ্র বিজ্ঞানীরা বলেছিলেন — সমুদ্রবাঁধ করা সত্ত্বেও পর্যটন কেন্দ্র দীঘা ও তৎসংলগ্ন এলাকাকে সমুদ্রের গ্রাস থেকে বাঁচানো যাবে না। অথচ বাস্তবে দেখা যায় সুবর্ণরেখা নদী মোহনা থেকে প্রাকৃতিক নিয়মে সৃষ্ট বালুচর ক্রমশ পূর্বদিকে এগিয়ে এসে দীঘার নিকটস্থ তালশারী ও নিউ দীঘাকে সমুদ্রভাঙন থেকে রক্ষা করেছে। এই বালুচর একইভাবে যদি আরও পূর্বদিকে ক্রমে অগ্রসর হয়, প্রাকৃতিক নিয়মে পুরনো দীঘা সহ শঙ্করপুর সামুদ্রিক ক্ষয় থেকে বেঁচে যাবে। সমুদ্রবিজ্ঞানীরা কি বাস্তব প্রাকৃতিক পরিবর্তন স্বীকার করেন? তাই আমাদের ধারণা, সরকার যদি দীঘা-শঙ্করপুর এলাকার মৎস্যজীবী ও সংলগ্ন গ্রামীণ মানুষজনকে উচ্ছেদ করার পরিকল্পনা বাদ দিয়ে, ক্রমশ এগিয়ে আসা বালুচরের কথা মাথায় রেখে ভূমিক্ষয় প্রতিরোধের বিকল্প ব্যবস্থা করে তাহলে মৎস্যজীবী, শ্রমিক ও গ্রামবাসীসহ এলাকার জীবন-জীবিকা আরও সুরক্ষিত হবে। অন্যথায় মৎস্যজীবীদের মরণ-বাঁচন লড়াই ছাড়া অন্য কোন পথ আছে কি ?

(সমুদ্রবার্তা, বিশেষ সংখ্যা ১১.২.০৪ প্রণব কুমার করের প্রবন্ধ থেকে)

অসহায় মৎস্যজীবীদের একটি করুণ কাহিনী

শঙ্করপুর-মৎস্যবন্দর থেকে 'জয় মা কালী ট্রলারে' চেপে গত ২৬ ডিসেম্বর ২০০৩ দীঘার নিকটবর্তী বঙ্গোপসাগরে মৎস্য শিকারে পাড়ি দেয় রবীন্দ্রনাথ মাঝি, সুভাষ কর, বনমালী কর, ভূতনাথ কর, সুধীরচন্দ্র গিরি, শশাঙ্ক বেরা, ধনঞ্জয় গিরি, হিমাংশু বেরা, অমৃত জানা, শ্যামসুন্দর পাত্র প্রমুখ মৎস্যজীবীরা। কয়েকদিন মৎস্য শিকার করার পর ট্রলার-এর মেশিন খারাপ হয়ে যায়। কূলে ফেরার উপায় হিসাবে কোন জলযানও কাছাকাছি ছিল না। ঋণগ্রস্ত ট্রলার মালিক ট্রলারে দিতে পারেনি কোন ওয়ারলেস সেট। নিরুপায় অবস্থায় মৎস্যজীবীরা অকূল দরিয়ায় ভাসতে ভাসতে পূর্ব দিকে আরও গভীর সমুদ্রে চলে যায়। এমনি করে কেটে যায় ১৫টি দিন। ফুরিয়ে যায় পানীয় জল, জীবনধারণের রসদ। প্রাণ বাঁচানোর সংগ্রামে লিপ্ত মৎস্যজীবীরা ঠিক করে ট্রলারের বরফ জল খেয়ে কোন রকমে বাঁচতে হবে। এমনি করে কাটে আরও কয়েকটি দিন। উদ্ভব হয় নতুন এক সমস্যা। ঋণগ্রস্ত ট্রলার মালিকের পুত্র রবীন্দ্রনাথ মাঝি ঋণের তাড়নায় সঙ্গ নিয়েছিল মৎস্য শিকারীদের। এতগুলো জীবনকে কীভাবে ঘরে ফেরাবে এই চিন্তা করতে করতে হঠাৎ অকাল মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে রবীন্দ্রনাথ। বাঁচার আশা, ঘরে ফেরার আশা তখনও ছাড়েনি বাকি মৎস্যজীবীরা। তারা রবীন্দ্রনাথের অসাড় দেহ সযত্নে আগলে রাখে। মৃতদেহ ঘরে ফেরানোর আশায় কেটে যায় আরও কয়েকটি দিন। রবীন্দ্রের দেহ পচে গলে বের হয় দুর্গন্ধ। একদিকে খাদ্য নেই। পানীয় বরফ গলা জল। তার উপর দুর্গন্ধ। অগত্যা বাধ্য হয়ে চোখের জল ফেলতে ফেলতে বাকি মৎস্যজীবীরা তাদের প্রিয়জন রবীন্দ্রনাথের দেহ সাগরের জলে ভাসিয়ে শেষ বিদায় দেয়। এমনভাবে কাটে আরও কয়েকটি দিন। আসে ১৯ জানুয়ারি ২০০৪, বাংলাদেশি একটি জলযান মৃতপ্রায় মৎস্যজীবীসহ ভাসমান ট্রলারটিকে উদ্ধার করে। পরের দিন ২০ জানুয়ারি কাকদ্বীপগামী একটি ট্রলার এদের ফেরত নিয়ে আসে। তখন মৎস্যজীবীরা জ্ঞানহীন। ২১ জানুয়ারি দীঘাগামী ট্রলারে করে উক্ত মৎস্যজীবীদের দীঘা ফিসারম্যান অ্যান্ড ফিস ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশনে আনা হলে কর্মকর্তারা তাদের দীঘা স্টেট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন। এদিকে ট্রলারটি মৎস্যজীবীদের নিয়ে যথাসময়ে না ফেরায় দীঘা-শঙ্করপুর মৎস্যজীবী ও মৎস্য ব্যবসায়ী সমিতি এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনাইটেড ফিসারম্যান অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা মন্ত্রীসহ রাজ্য প্রশাসনের কর্মকর্তাদের বারবার জানালেও তেমন কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। উপায়হীন মৎস্যজীবী পরিবারের মা, বোন, স্ত্রী, ছেলে-মেয়েরা পথে পথে কেঁদে বেড়ায় আর সরকার এক্ষেত্রে উদাসীন। জানা যায়, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে সরকার মৎস্যজীবীদের উদ্ধারের জন্য সরকারি সাহায্য ও সহযোগিতায় প্রতিটি মৎস্যযানে ওয়ারলেস ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু আমাদের রাজ্যে এখনও কোনরূপ ব্যবস্থা নেই। ওয়েস্টবেঙ্গল ইউনাইটেড ফিসারম্যান অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে বার বার কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে জানানো সত্ত্বেও কোন প্রতিকার হয়নি। সরকার আজ বৃহৎ পুঁজিপতিদের হাজার হাজার কোটি টাকা কর ছাড় দিচ্ছে, মন্ত্রী আমলাদের বিলাস ব্যসনে হাজার-হাজার কোটি টাকা ব্যয় করছে, অথচ গরিব মৎস্যজীবীদের নিরাপত্তার প্রশ্নে কোন ব্যবস্থা নেই কেন — এ প্রশ্ন আজ লক্ষ লক্ষ মৎস্যজীবীর।

সমবায় সমিতি কর্মচারীদের ভুখা মিছিল

পশ্চিমবঙ্গ কো-অপারেটিভ এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির ডাকে ৩ মার্চ রাজ্যের কয়েক হাজার সমবায় সমিতির কর্মচারী সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে ভুখা মিছিল করে রানি রাসমণি রোডে সমবেত হন। সমাবেশ থেকে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হজরত গাজীর নেতৃত্বে হারাধন পাত্র, সাইদুর রহমান, আর কে রাই মহাকরণে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে স্মারকলিপি দেন। স্মারকলিপিতে ৬ দফা দাবি জানানো হয়। অবিলম্বে বেতন কমিটির সুপারিশ কার্যকর করা, সমবায় বিভাগের শূন্যপদগুলিতে সমবায় সমিতির দক্ষ কর্মচারীদের নিয়োগ, অন্তর্বর্তীকালীন ভাতার শর্ত পরিবর্তন করে ফিশারি, তন্তুবায় ইত্যাদি সমিতির সকল কর্মচারীদের বকেয়া প্রাপ্য অবিলম্বে মিটিয়ে দেওয়া, বিভিন্ন ক্যাডার অথরিটিতে জমা ৮৫ কোটি টাকা সুদ সহ সমস্ত কর্মচারীদের মধ্যে বন্টন করা, শস্য ঋণদান নিয়মাবলীর বিধান বর্হিভূত আদায়ীকৃত ৪০০ কোটি টাকা সমিতিগুলিকে ফেরত দেওয়া ও অতিরিক্ত সুদ আদায় বন্ধ করা, তিন জেলার সমিতিগুলির কাছ থেকে স্পেশাল বরোয়ার ডিপোজিট আদায় বন্ধ করা এবং এ পর্যন্ত ঐখাতে জমা টাকার ওপর ১৩ শতাংশ হারে সুদ দাবি করা হয়েছে।

ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক হজরত গাজী বলেন, দাবিগুলি সরকার যদি পূরণ না করে তবে আগামী দিনে সমবায় ব্যাঙ্কের সঙ্গে লাগাতার অসহযোগ আন্দোলন শুরু করা হবে।

আরিস্তিদেকে দেশ ছাড়তে বাধ্য করা হল

পাঁচের পাতার পর

হিংসাকে অস্বীকার করা ও মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা, হাইতির সংস্কৃতির প্রতি অঙ্গীকার ইত্যাদি। এমন একজন ব্যক্তি হচ্ছেন আরিস্তিদে, যাঁকে বুশ ক্ষমতাচ্যুত করল।

হাইতিতে বুশ সরকারের জঘন্য ভূমিকা উদ্‌ঘাটিত করার জন্য র‍্যামসে ক্লার্ক মার্কিন কংগ্রেসের কাছে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি নিয়ে অবিলম্বে তদন্ত করার দাবি জানিয়েছেন ঃ

১) প্রেসিডেন্ট আরিস্তিদেকে হাইতি থেকে সরতে বাধ্য করার কাজে আমেরিকার ভূমিকা কী ছিল,

২) হাইতির বিরুদ্ধে আক্রমণে ট্রেনিং ও অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে কতখানি সাহায্য করেছিল বুশ সরকার,

৩) হাইতির সমাজব্যবস্থাকে টলিয়ে দিতে ও সেখানকার পূর্বতন সামরিক বাহিনী, 'ফ্রাফ' ও ধনকুবেরদের মদত দিতে বুশ সরকার কী কী করেছিল,

৪) আরিস্তিদে এতদিন বলছিলেন তিনি কিছুতেই দেশ ছাড়বেন না, তাহলে হঠাৎ মত পাল্টে তিনি কেন দেশ ছাড়লেন ও দূরের একটি দেশের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিলেন, এর পিছনে মার্কিন ভূমিকা কী ছিল,

৫) প্রেসিডেন্ট দেশ ছাড়তে বাধ্য হওয়ার আগে কেন বুশ সরকার হাইতির পূর্বতন সেনাদের, 'ফ্রাফ'-এর লোকেদের ও অন্যান্য সশস্ত্র গুণ্ডাবাহিনীকে যেসব অস্ত্র আমেরিকাই দিয়েছিল তা পরিত্যাগ করতে দাবি তুলল না, এক্ষেত্রে বুশ সরকারের ব্যর্থতার কী ব্যাখ্যা আছে,

৬) কেন গণতান্ত্রিক পথে নির্বাচিত হাইতির প্রেসিডেন্টকে তার সাংবিধানিক ক্ষমতা ছেড়ে দিতে বাধ্য করার জন্য ওয়াশিংটন সবরকম চাপ সৃষ্টি করেছিল,

৭) ঠিক যেমন করে টুসেঁ লুভের্তিয়রকে ১৮০৩ সালে অপহরণ করে ফ্রান্সে বন্দী করা হয়েছিল এবং ১৯০১ সালে ফিলিপাইন-আমেরিকা যুদ্ধ শেষ করার জন্য মার্কিন সৈন্যরা ফিলিপাইন রাষ্ট্রপতি এমিলো আগুইনাল্ডোকে অপহরণ করেছিল, কেন সেই একই কায়দায় প্রেসিডেন্ট আরিস্তিদেকে বস্তুত অপহরণ করা হল?

যতদিন না মার্কিন সামরিক ও অর্থনৈতিক হস্তক্ষেপ এবং অন্য দেশের সরকারের পতন ঘটানোর চক্রান্ত বন্ধ হচ্ছে, সকলের জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত হচ্ছে, অতীতে হাইতির প্রতি যে আক্রমণ হয়েছে, তার ক্ষতিপূরণ দেওয়া হচ্ছে এবং তাঁর নিজের দেশের জনগণের স্বার্থে কাজ করার জন্য যতদিন না প্রেসিডেন্ট আরিস্তিদে হাইতি ফিরে আসছেন — ততদিন পশ্চিম গোলার্ধ নিরাপদ হবে না বা এখানে আনন্দ থাকবে না।

মার্চ ০১- ২০০৪

কংগ্রেসের মুখেও চাকরির প্রতিশ্রুতি

গত নির্বাচনে বাজপেয়ি দিয়েছিলেন বছরে এক কোটি করে চাকরির প্রতিশ্রুতি। এবারের নির্বাচনে কংগ্রেস বলছে — পরিবার পিছু একজনের চাকরি। সি পি এম এরাজ্যে ৪৪টি বড় শিল্পে ৩৪ হাজার চাকরির ব্যবস্থা করবে বলেছে ভোটের ঠিক আগে। পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রে ভোটের বালাই এইটুকুই। রিগিং করে জিততে হলেও তা বিশ্বাসযোগ্য করতে ভোটের হাওয়া তুলতে হয়, কাজেই মানুষকে ধোঁকা দিতে প্রতিশ্রুতির ডালি সাজাতে হয় রংবেরঙের মিথ্যার ফুল দিয়ে।

এই ট্র্যাডিশন চলছে দীর্ঘদিন। সত্তরের দশকে ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে এই কংগ্রেসই দিয়েছিল ''গরিবি হঠাও'' স্লোগান। দিল্লির তুর্কমান গেটে বুলডোজার দিয়ে বসতি উচ্ছেদ করেছিল কংগ্রেস। লোকে ব্যাখ্যা দিয়েছিল স্লোগানটা আসলে 'গরিব হঠাও'। গরিব ও গরিবি কোনটাই হঠেনি, দুটোই বাড়ছে। ৮০'র দশকে রাজীব গান্ধী দিয়েছিলেন 'হাইটেক' প্রতিশ্রুতি। কংগ্রেস দেশের অর্থনীতির দরজা খুলে দিয়েছিল বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির সামনে। ভারতের অর্থনীতি ও দুর্নীতি — দুই বাজারেই বেড়েছিল ইতালিয় মাফিয়াদের প্রভাব। 'নয়া ভারতে'র খোয়াবের ফেরিওয়ালা শ্যাম পিত্রোদা মঞ্চ আলো করে বসেছিলেন। তারপর এল নরসিংহ-মনমোহন জুটির নয়া আর্থিক নীতি। বেসরকারীকরণ আর বিদেশি পুঁজি এসে ভারতকে তরিয়ে দেবে — এই ছিল তাদের প্রতিশ্রুতি। কাগজপত্র গরম গরম ব্যাখ্যা দিল — এতদিন রাজনীতিবিদেরা অর্থনীতি চালিয়েছে বলেই নাকি দেশের হাল ফেরেনি। এবার যখন ঝানু অর্থনীতিবিদ মনমোহনজি হাল ধরেছেন তখন উন্নয়নের হদ্দমুদ্দ হল বলে। আদিখ্যেতা করে সংবাদপত্র বলল, ইকনমিক্স নয় মনমোহনোমিক্স। আশ্বাস, প্রতিশ্রুতির বন্যা বইল — 'ভুখা মানুষ পেটের গামছা আর একটু কষে বেঁধে কদিন সবুর করো'। কদিন? মনমোহনজি বললেন, পাঁচ বছর। গোড়ায় ধনীরা আরও ধনী হচ্ছে বটে তবে এরপর মধ্যবিত্তেরা উঠবে, তারপর উন্নয়নের রস চুঁইয়ে চুঁইয়ে নামবে গরিবের কুঁড়েয়। খেজুর রস যেমন জমে হাঁড়িতে। 'নয়া তত্ত্ব'র নামও হল গালভরা — ''ট্রিকল ডাউন থিওরি''। কিন্তু বড়লোকে খেলে গরিবের পেট ভরবে — এমন কল বের হয়নি কোথাও। পাঁচ বছর পর মনমোহনজি বললেন আর পাঁচ বছর; এই করে দুটো ইলেকশন পার করলেন খোয়াব দেখিয়ে। মনমোহন সার্থক নামা বটে তবে তিনি জন-মনমোহন না হয়ে মালিক-মনমোহন প্রমাণিত হলেন। তাঁর তখ্ত গেল।

এলেন চিদাম্বরম্। মনমোহনের ভাবশিষ্য বটে তবে কংগ্রেস ছেড়ে তিনি কংগ্রেসবিরোধী মোর্চায় ভিড়লেন। পেছনে দাঁড়াল সি পি এম। কিন্তু তফাৎ কই? মোর্চা সরকার অকংগ্রেসি বটে, তবে টাকার এপিঠ আর ওপিঠ।

সবশেষে এসেছে বিজেপি; স্বদেশি নামাবলী ছেড়ে তারাও এখন মার্কিন ভজনা করছে প্রাণ ঢেলে। তারাও চলছে সেই মনমোহনের ধারায়। অর্থাৎ সরকার পাল্টাচ্ছে, শাসক দলের রং পাল্টাচ্ছে। পাল্টাচ্ছে না নীতি, যে নীতি মালিকশ্রেণীর মুনাফা বাড়াচ্ছে অবিরাম, ধনীকে আরও ধনী করছে, মধ্যবিত্ত ও গরিবকে মারছে। এটাকে ঢাকতেই শাসকদল বা গদি প্রত্যাশী বিরোধীরা অকাতরে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। যদি মনে হত, এসব প্রতিশ্রুতির কিছুটা হলেও পূরণ করতে হবে, তবে হয়ত মুখের ওপর বিবেকের লাগাম থাকত। কিন্তু এসব নেতারা জানেন প্রতিশ্রুতি দেওয়াই হচ্ছে ভাঙার জন্য। মরদ কি বাত এখন আর হাতি কা দাঁত নয় — ওটা লোককে ধোঁকা দেওয়ার হাতিয়ার। তারা জানে প্রতিশ্রুতি না রাখলে জনগণ কিছু করতে পারবে না। কারণ তারা হয় অসংগঠিত, না হয় সংগঠিত সেইসব দলের দ্বারা যারা জনগণকে ঠকায়। জনগণের যদি নিজস্ব বিকল্প শক্তি থাকত, গণআন্দোলনের শক্তি থাকত তবে ঝুড়ি ঝুড়ি ভাঁওতা দেওয়ার আগে তাদের ভাবতে হত। তাই এসব প্রতিশ্রুতি শুনে শুধু বিরক্ত হলেই হবে না, ভোটবাজ দলগুলির উপর ক্ষোভ ও বিরক্তিকে সংগঠিত রূপ দিয়ে গণআন্দোলনের বিকল্প শক্তির পাশে দাঁড়াতে হবে যাতে এসব প্রতারণার কবর খোঁড়া যায়।

ট্যাক্সবৃদ্ধি ও মদের দোকানের ঢালাও লাইসেন্স দেওয়ার প্রতিবাদে নদীয়ায় পঞ্চায়েতে ডেপুটেশন

সি পি এম ফ্রন্ট সরকারের নয়া খাজনানীতির প্রতিবাদে, আদায়ীকৃত মকুব খাজনা ফেরত, খাজনা মকুব সার্টিফিকেট দেওয়ার দাবিতে ৫ ফেব্রুয়ারি নদীয়ার করিমপুর হোগলবেড়িয়া আর আই অফিসে ডেপুটেশন দিতে কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের উদ্যোগে কমরেডস ধনপতি মণ্ডল, সিদ্দিক সর্দার ও সুবলচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে দুই শতাধিক কৃষক ও ক্ষেতমজুর গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের সামনে জমায়েত হন। আর আই উপস্থিত থাকার লিখিত সম্মতি দিয়েও ডেপুটেশনের দিন উপস্থিত না থাকায় কৃষক ও খেতমজুররা বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। আর আই অফিসের কর্মচারীরা উপস্থিত জনতার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে আর এক দিন ডেপুটেশন দিতে আসার অনুরোধ জানান। পঞ্চায়েত অফিস চত্বরে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ চলে। এই জমায়েতে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের করিমপুর লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড ধনপতি মণ্ডল, এস ইউ সি আই করিমপুর লোকাল কমিটির সম্পাদক আজাদ রহমান, সমর বিশ্বাস, ডাঃ অজয় মন্ডল প্রমুখ। সভায় সভাপতিত্ব করেন কমরেড অমিয় দাস বৈরাগ্য।

* * *

২৫ ফেব্রুয়ারি নদীয়া করিমপুর ২নং ব্লকের নতিডাঙ্গা ২নং গ্রাম পঞ্চায়েতে কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের উদ্যোগে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন কমরেড কাজী আফতাব হোসেন। পঞ্চায়েতে নয়া ট্যাক্স বাতিল করা, বি পি এল তালিকায় গরীবদের নাম নথিভুক্ত করা, কৃষক ও খেতমজুরদের পরিচয়পত্র দান, মদের দোকানের ঢালাও লাইসেন্স দেওয়া এবং ভিডিও হলে অশ্লীল চিত্র প্রদর্শনী ও এলাকায় অসামাজিক কাজকর্ম বন্ধ করার দাবি করা হয়। উপপ্রধান ডেপুটেশন নেন এবং দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন।

ডেপুটেশনের শেষে থানা পাড়া হাটে এক সভা করা হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন কমরেডস্ শেরফুল আনসারী, কাজী আলতাফ হোসেন ও মসিকুর রহমান।

সি পি এম-ও 'পশ্চিমবঙ্গের উদয়' প্রচার করছে

বিজেপি সরকারের 'ভারত উদয়' নামক মিথ্যা প্রচারের কড়া নিন্দা করেছে সি পি এম। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও বিভিন্ন নির্বাচনী সভায় বিজেপি'র এই মিথ্যা প্রচারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ করেছেন। বিজেপি'র ভূমিকা যথার্থই নিন্দনীয়। কিন্তু মজার কথা হল, পশ্চিমবঙ্গে সি পি এম-এর ফ্রন্ট সরকারও যে হুবহু বিজেপি'র ঢংয়েই এবং জনগণের টাকায় টি-ভি ও সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়েছে এবং যথারীতি মিথ্যার আশ্রয়ও নিয়েছে, সে ব্যাপারে সি পি এম নেতৃত্ব নীরব। অবশ্য মুখে এক কথা ও কাজে ঠিক উল্টো করার বৈশিষ্ট্য সি পি এম রাজনীতির মজ্জাগত বলা যায়।

গত ৮ ফেব্রুয়ারি মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘিতে একটি বিদ্যুৎ প্রকল্পের শিলান্যাস করতে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এসব অনুষ্ঠানের ঘোষণা বিজ্ঞাপিত করা পুরনো রীতি, এবং রাজ্যের মানুষকে জানাতে সরকার বিজ্ঞাপন দিতে পারে। কিন্তু যে সরকার টাকার অভাবের দোহাই দিয়ে গ্রামের গরিবের হাঁস-মুরগি-সাইকেলের উপরও কর চাপায়, সেই সরকারের বিজ্ঞাপনের পিছনে খরচের বহরে সংযম থাকার কথা। কিন্তু দেখা গেল, সি পি এম-এর মুখপত্র সহ রাজ্যের নানা সংবাদপত্রে বিশাল আকারে অর্থাৎ প্রচুর অর্থ ব্যয় করে একটি প্রকল্পের শিলান্যাস অনুষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দেওয়া হল, যেটা বিজেপি, কংগ্রেস ও তৃণমূল কংগ্রেসের মত দলগুলো সরকারে বসে করে থাকে।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তৃতাতেও প্রতিশ্রুতির খই ফুটল ঠিক বিজেপি কংগ্রেসের ঢঙেই। মুখ্যমন্ত্রী জানেন, 'রাজ্যের উন্নয়ন ঘটছে' বলে যতই বিজ্ঞাপন দেওয়া হোক, তাতে এখন আর চিঁড়ে ভিজছে না। বেকার সমস্যায় জর্জরিত মানুষ চাকরির হদিশ চায়। অতএব, নির্বাচন যখন সামনে তখন চাকরির প্রতিশ্রুতি দিতেই হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, সাগরদিঘি প্রকল্পে চার হাজার মানুষের চাকরি হবে। সদ্য যে প্রকল্পের শিলান্যাস করা হল, সেখানে ঠিক কতজনের কর্মসংস্থান হবে, তার সংখ্যা মুখ্যমন্ত্রী বলেন কীসের ভিত্তিতে? আসলে প্রকল্পের কাঠামো ও অন্যান্য বিষয় গড়ে তুলতে বিভিন্ন ঠিকাদাররা যেসব লোক নিয়োগ করবে, তাকেই তিনি 'কর্মসংস্থান' বলে চালিয়ে দিলেন। বিজেপি সরকারও একইভাবে হাইওয়ে তৈরির প্রকল্পে ''হাজার হাজার মানুষের'' কর্মসংস্থানের হিসাব দিয়ে দেখায়, তাদের শাসনে কত মানুষের চাকরি হয়েছে।

এই ধারাতেই ৪ মার্চ গণশক্তি পত্রিকার প্রথম পাতায় মোটা অক্ষরের হেডিং দিয়ে একটি সংবাদ লক্ষ্য করার মতো। বিজ্ঞাপনের কায়দায় বলা হয়েছে ''একই সঙ্গে ৪৪টি বড় শিল্প হচ্ছে।'' একটা-দুটো নয়, একেবারে ৪৪টা শিল্প, তাও আবার একই সঙ্গে। খবরটা জানিয়েছেন স্বয়ং শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী নিরুপম সেন। সংবাদের বিবরণ থেকে জানা গেল — রাজ্যে একই সঙ্গে ৪৪টি মেগাশিল্প প্রকল্প স্থাপনের বিষয়ে চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে রাজ্য সরকার। অর্থাৎ, শিল্প স্থাপন করার কথা হয়েছে। এরকম কথা ও বাস্তবে তা কার্যকর হওয়ার মধ্যে বিস্তর ব্যবধানের এত ভুরি ভুরি নজির এই পশ্চিমবঙ্গে রয়েছে, যা সাধারণ মানুষও জানেন। এ কেবল এই রাজ্যেরই ছবি নয়, ভারতের সকল রাজ্যেই ছবিটা একইরকম। একটি তথ্যে দেখা যাচ্ছে, ১৯৯১ সাল থেকে ভারতের শিল্পপতিরা যতগুলো শিল্প স্থাপন করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, বাস্তবে তার ১০ভাগও রূপায়িত হয়েছে কী না সন্দেহ (ইকনমিক টাইমস্ ১-৩-০৪)। অথচ, শ্রমিকের মজুরি কমিয়ে দিয়ে, শ্রমিক ছাঁটাই করে, কিছু টাকা হাতে দিয়ে কর্মচারীদের বিদায় করে (ভি আর এস) এবং ঋণের উপর সুদ হ্রাসের সুযোগ নিয়ে শিল্পপতিরা মুনাফা বাড়িয়েই চলেছে। যাই হোক, মূল কথা হচ্ছে, শিল্পস্থাপনের জন্য প্রতিশ্রুতির সঙ্গে বাস্তবের হিসাব গত এক দশক ধরেই মিলছে না। তবুও সি পি এম ফ্রন্ট সরকারের শিল্প বাণিজ্যমন্ত্রী এমন একটি ঘোষণা করলেন কেন ? গণশক্তির প্রথম পাতায় তা প্রকাশই বা করা হল কেন? কারণ, সামনে ভোট। তাই গণশক্তি কেবল ৪৪টি 'মেগাশিল্প' স্থাপনের কথা জানিয়েই শেষ করেনি, বলেছে, ২৫ কোটি টাকার কম বিনিয়োগের শিল্প ইউনিট নাকি শতাধিক সংখ্যায় গড়ে উঠতে চলেছে এই রাজ্যে। কিন্তু প্রশ্নটা যেহেতু চাকরিকে ঘিরে উঠবেই, তাই এক্ষেত্রেও গণশক্তি পিছিয়ে থাকেনি। যেসব সংস্থা এখনও ভূমিষ্ঠই হয়নি সেখানে কর্মসংস্থান কতজনের হবে, সে সম্পর্কে আন্দাজ-অনুমান নয়, একেবারে নিখুঁত সংখ্যাও জানিয়ে দিয়েছে তারা। প্রকল্পের রিপোর্ট অনুযায়ী নাকি এর ফলে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে ৩৪ হাজার ২৬৭ জনের। লক্ষ করুন, 'রাউন্ড ফিগার' নয়, একেবারে মানুষের মাথা গুণে বলার মতো নিখুঁত সংখ্যা দেওয়া হল। পরিসংখ্যানকে খাঁটি প্রমাণ করতে এটা করা হলেও এইভাবে চাকরির সংখ্যা বলে দেওয়াই বুঝিয়ে দেয়, হিসাবটা পুরোই জল মেশানো। কারণ, এভাবে আগে-ভাগে চাকরির সংখ্যা বলে দেওয়াটাই অবাস্তব। অবশ্য সি পি এম নেতারা বলতেই পারেন যে, রাম না জন্মাতেই যদি রামায়ণ লেখা সম্ভব হয়ে থাকে, তবে শিল্প না হতেই চাকরির সংখ্যা বলে দেওয়া যাবে না কেন? সর্বোপরি সামনে যখন ভোট, তখন বেকারদের ধোঁকা দিতে সবই করা যায়।

স্ট্যালিন স্মরণসভা

তিনের পাতার পর

শিবদাস ঘোষ আন্তর্জাতিক নেতৃত্বের ত্রুটি-বিচ্যুতি লক্ষ্য করে বহুদিন আগেই হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। যেজন্য সোভিয়েটে সমাজতন্ত্রের পতনে আমরা গভীর ব্যথা পেয়েছি, কিন্তু ভেঙে পড়িনি। কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন যে, স্ট্যালিনের মতো বিশাল কমিউনিস্ট নেতার চরিত্রকে মানবতাবাদী মূল্যবোধের মাপকাঠি দিয়ে বিচার করলে সত্য পাওয়া যাবে না, সর্বহারা মূল্যবোধ আয়ত্ত করতে হবে। স্ট্যালিনের কাছে বিপ্লব, সমাজতন্ত্র ও পার্টির চেয়ে বড় প্রিয়জন কেউ ছিল না। সমাজতন্ত্রকে রক্ষার জন্য যা করা প্রয়োজন মনে করেছেন, তিনি সেটাই করেছেন। স্ট্যালিনকে শত্রু বানিয়েছে তারাই যারা আমাদের শত্রু, সমাজতন্ত্রের শত্রু, শ্রমিকশ্রেণীর শত্রু।

আন্তর্জাতিক সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে সভা শেষ হয়।

POSTAL REGISTRATION NO.
SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2004-06

R. No 5268 / 60

উদিত ভারত !

১। দেশে ২৫ কোটি কৃষকের রেশন কার্ড নেই। রেশন কার্ডের ব্যবস্থা না করে সরকার দিচ্ছে ক্রেডিট কার্ড। ব্যাঙ্ক দেবে এই ক্রেডিট কার্ড। কারা পাবে? অবশ্যই ধনী কৃষকরা।

২। উদার অর্থনীতির ফলে

ক) শুধু মহারাষ্ট্রেই ৮ হাজারের বেশি শিশু অপুষ্টিতে মারা গেছে,

খ) গত তিন বছরে রাজস্থানে প্রায় ২ হাজার কৃষক ফসলের দাম না পেয়ে দেনার দায়ে আত্মঘাতী হয়েছেন,

গ) অন্ধ্রপ্রদেশে ১০০ জনেরও বেশি কৃষক ক্ষিদের জ্বালা মেটাতে কিডনি বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছেন,

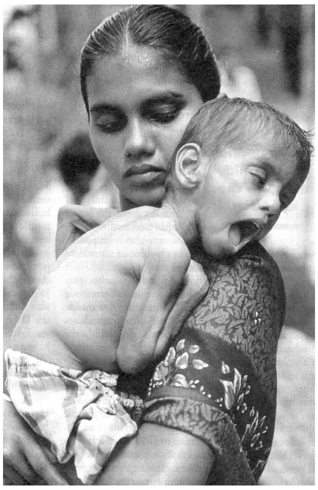

ঘ) অন্ধ্রপ্রদেশে কেবল অনন্তপুর, জেলাতেই ১৯৯৭-২০০০ এই চার বছরে ১৮২৬ জন প্রান্তিক চাষী আত্মহত্যা করেছেন।

৩। পূর্ব ভারতের হিন্দুস্থান ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন লিমিটেড ও ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া লিমিটেডের সবকটি ইউনিট বন্ধ হওয়ায় ১২০০ কর্মী চাকরি হারিয়েছেন।

৪। ক) ভারতে ২৩ কোটি ৩০ লক্ষ মানুষ দু'বেলা খেতে পান না।

খ) ভারতে প্রতিদিন ৫ হাজার শিশুর মৃত্যু হচ্ছে অপুষ্টিতে, ঠিকমত খেতে না পেয়ে।

(রাষ্ট্র সংঘের হিউম্যান ডেভেলাপমেন্ট রিপোর্ট ২০০৩)

গ) ১৯৯৫-৯৭ পর্যন্ত অপুষ্টির শিকার ছিল ১৯ কোটি ৪৭ লক্ষ ভারতবাসী ১৯৯৯-২০০১ পর্যন্ত অপুষ্টির শিকার হয় ২১ কোটি ৩৭ লক্ষ ভারতবাসী

(রাষ্ট্রসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (ফাও)র সমীক্ষা রিপোর্ট, স্টেট অব ফুড ইনসিকিউরিটি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ২০০৩)

ঘ) দেশের গুদামে ৬ কোটি টনের বেশি খাদ্যশস্য পচে নষ্ট হচ্ছে। (কেন্দ্রীয় সরকারের সমীক্ষা রিপোর্ট, ন্যাশনাল স্যাম্পেল সার্ভে, ২০০১-০২)

শ্রমজীবী মানুষের উপর আক্রমণে এরা নীরব কেন

দুয়ের পাতার পর

একদিকে তাঁরা মালিকতোষণ নীতির পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে যেমন অনবরত আন্দোলন দমনের হুঙ্কার দিচ্ছেন, অন্যদিকে ব্যাপক শ্রমজীবী জনসাধারণকে ভোলাতে বন্ধের সমর্থনে গলা ফাটাচ্ছেন। এই দ্বিচারিতাই আন্দোলনের বিশ্বাসযোগ্যতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করছে। আমাদের এই কথাগুলো আমরা আশা করব তারা ভেবে দেখবেন।

আর একটি বিষয় উল্লেখ করাও এখানে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হবে। ২৪ ফেব্রুয়ারি এ রাজ্যের খেটে খাওয়া মানুষ স্বতঃস্ফূর্ততার সঙ্গে যেভাবে ধর্মঘটে সামিল হয়েছেন তার উল্লেখ না করলেও বিচ্ছিন্নভাবে দু'একটি জায়গায় জোর করে ধর্মঘট করানোর যেসব ঘটনা ঘটেছে, সংবাদপত্রগুলি সেসব ঘটনার বর্ণনায় অত্যন্ত সরব ছিল। শ্রমিক আন্দোলনের প্রতি সত্যিকারের দায়বদ্ধতা থাকলে সিটু ধর্মঘটে অনিচ্ছুক শ্রমিকদের ওপর এধরনের নিন্দনীয় ঘটনা ঘটতে দিত না। তারা আগে থেকেই আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে শ্রমিক-কর্মচারীদের বিভ্রান্তি দূর করে আন্দোলনের পক্ষে নিয়ে আসবার চেষ্টা করত। কারণ এ ধরনের ঘটনা শ্রমিক আন্দোলনকেই দুর্বল করে দেয় এবং পুঁজিপতিদের পেটোয়া সংবাদমাধ্যমগুলি এসব ঘটনার সুযোগ নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে আন্দোলনবিরোধী মানসিকতা সৃষ্টি করার সুযোগ পায়।

আমরা আবারও স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, কেন্দ্র ও রাজ্যের সরকার ভোটের ঝুলি ভর্তি করার আশায় রঙ-বেরঙের বিজ্ঞাপনের পেছনে যখন শত শত কোটি টাকা উড়িয়ে দিতে ব্যস্ত, তখন নিঃশব্দে ঝরে যাচ্ছে বন্ধ হয়ে যাওয়া কারখানার হাজার হাজার শ্রমিকের প্রাণ। অনাহারে অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে মরছে বন্ধ চা-বাগানগুলির অসংখ্য শ্রমিক। পরিবারের জন্য খাবারের সংস্থান করতে না পেরে দুশ্চিন্তায়, ক্ষোভে কাজ হারানো শ্রমিকরা একের পর এক আত্মহত্যা করছে, সন্তানের মুখে দু-মুঠো ভাত তুলে দিতে না পারার যন্ত্রণায় তাদের গলায় বিষ ঢেলে দিয়ে আত্মঘাতী হচ্ছে অসহায় শ্রমিক-বধূ। বেকার জীবনের দুঃসহ গ্লানি বইতে না পেরে যুবশক্তির বিরাট এক অংশ নিজেদের ভাসিয়ে দিচ্ছে মদ-জুয়া-সাট্টার স্রোতে। নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার পাল্টে এ সমস্যার সমাধান হবে না। এর জন্য চাই পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লবের পরিপূরক ব্যাপক লাগাতার শক্তিশালী শ্রমিক আন্দোলন। কিন্তু আন্দোলনের নামে হঠাৎ একদিন বন্ধে সামিল হয়ে এবং বন্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার পরই আবার পুঁজি-মালিকদের পদলেহন করতে শুরু করার দ্বারা সি পি এম এবং সিটু নেতৃত্ব শুধু যে জনমনে দলের বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়ে ফেলছেন তাই নয়, চূড়ান্ত ক্ষতি করছেন বামপন্থী আন্দোলনেরও। তাঁদের এই দুমুখো নীতির দ্বারা কলঙ্কিত হচ্ছে বামপন্থা।

এই অবস্থায় সিটু এবং সি পি এমের সাধারণ সৎ কর্মী-সমর্থকদের ভেবে দেখতে হবে কোন্ পথে তাঁরা চলবেন। হয় নেতৃত্বের অনুসৃত বর্তমান নীতি অনুসরণ করে তাঁরা খোলাখুলি মালিক তোষণের নীতি গ্রহণ করুন, অথবা সততা এবং আন্তরিকতার সঙ্গে বিরোধী শ্রমিকদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পুঁজিবাদবিরোধী লড়াইয়ে সামিল হোন। তাঁদের বুঝতে হবে যে, সরাসরি মালিকী আক্রমণের শিকার হয়ে বাঁচবার রাস্তা হিসাবে আন্দোলন তাঁরা চাইলেও তাঁদের নেতৃত্ব আজ আর তা চান না। ফলে হয় তাঁরা নেতৃত্বকে বাধ্য করুন দু-মুখো নীতি ত্যাগ করতে, অথবা সংগঠিত হোন্ শ্রমিকদের প্রতি বিশ্বস্ত ও দায়বদ্ধ শ্রমিক সংগঠনের পতাকার নিচে, যাতে নির্মম পুঁজিবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রকৃত শ্রেণী-দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ লাগাতার গণআন্দোলন গড়ে তোলা যায়।

চা-শ্রমিকদের সাইকেল মিছিল

একের পাতার পর

অর্থ, খাবার ও ওষুধপত্র। উদয়ন বিতান সহ একাধিক ক্লাবের সদস্যরা তাদের ক্লাবঘরের দরজা খুলে দিয়েছিল মিছিলকারীদের রাত্রিবাসের জন্য।

পরের দিন, ২৯ ফেব্রুয়ারি, আলিপুরদুয়ার থেকে রাজাভাতখাওয়া গারোপাড়া চা-বাগান হয়ে বেলা ১টায় পৌঁছল চা-বলয়ের অন্যতম কেন্দ্র কালচিনিতে। পার্শ্ববর্তী চা-বাগান কালচিনি, রায়সাটাং, চিঞ্চুলা বন্ধ। ডিমা বাগানে ৬ দিনের কাজ করিয়ে ৩ দিনের বেতন নিতে শ্রমিকদের বাধ্য করা হয়েছে। কালচিনির আপামর জনসাধারণ সামিল হয়েছিল মিছিলের সমর্থনে। অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, সাহিত্যিক রামাযোধ্যা প্রসাদ কিরণ সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিয়ে উৎসাহিত করলেন মিছিলকে। আবার চলা শুরু, আটিয়াবাড়ী, ভাত-খাওয়া, চিঞ্চুলা, রায়সাটাং-এর শ্রমিকরাও তখন সামিল। হাসিমারা, মাদারিহাট হয়ে বিকেলে মিছিল পৌঁছল বীরপাড়া শহরে।

রামঝোরা চা-বাগান ১৮ মাস ধরে বন্ধ। সেই বন্ধ বাগানের নিরন্ন শ্রমিকরাও সামিল হয়েছিল মিছিলে। ৭০ বছরের প্রবীণ সাইকেল আরোহী রামঝোরা চা-বাগানের কমরেড কাঞ্ছা রানারও সামিল। মুজনাই, ঢেকলাপাড়াও বন্ধ, ডানকান কোম্পানির ধুমচিপাড়া, লঙ্কাপাড়া, হান্টাপাড়া বাগানেও বেতন অনিশ্চিত, অনিয়মিত। বীরপাড়ার অবস্থাও ভাল নয়। ঐসব বাগান থেকেও শ্রমিকরা সামিল হল মিছিলে। বীরপাড়ার স্কুল ঘরে রাত কাটিয়ে ১ মার্চ সকাল ৭টায় আবার যাত্রা শুরু। বানারহাট সংলগ্ন এলাকা থেকে চা-শ্রমিকরা সাইকেল মিছিলে যোগ দিলেন ধূপগুড়িতে; মানবাজার মেটেলি, মেখলিগঞ্জের চা-শ্রমিকরা যুক্ত হলেন ময়নাগুড়িতে। ধূপগুড়ি ও ময়নাগুড়িতে তাদের সংবর্ধনায় পথসভা হল।

এরপর মিছিল এগিয়ে যেতে জলঢাকা ও তিস্তা নদীর ধারে স্থানীয় কৃষক ও খেতমজুর কমরেডরা মিছিল থামিয়ে খাবার দিলেন, যা তাঁরা বাড়ি বাড়ি থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। তিস্তাপাড়ের কৃষকরা প্রবীণ কমরেড কাঞ্ছা রানারকে পুষ্পস্তবক দিয়ে সংবর্ধনা জানালেন। মিছিলে যুক্ত হল রংধামালির, রায়পুর, ডেঙ্গুয়াঝাড়, ভাত্তিগুড়ি প্রভৃতি বাগানের শ্রমিকরা। বেলা ২টায় মিছিল এসে পৌঁছল জলপাইগুড়ি শহরে। ইতিমধ্যে তরাই-এর শ্রমিকরা শিলিগুড়ি থেকে রওনা দিয়ে পৌঁছে গেছেন সেখানে। যাত্রাপথে তাদের সাথে সামিল হয়েছেন রাজগঞ্জের চা-শ্রমিকরাও।

শহরের সমাজপাড়ায় তৈরি হয়েছিল সংবর্ধনা মঞ্চ। কমরেড শঙ্কর গাঙ্গুলি, কমরেড সুব্রত দত্তগুপ্ত শ্রমিকদের অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন। নর্থ বেঙ্গল টি প্ল্যানটেশন এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক কমরেড তপন ভৌমিকও বক্তব্য রাখেন। শ্রমিকদের পক্ষ থেকে কমরেড গোপী ছেত্রী (রামঝোরা), কমল উরাঁও, রাজকালিয়া রাম, সুষমা সাউ শ্রমিকদের সমস্যা ও তার প্রতিকারে গণআন্দোলনের আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য রাখেন।

এরপর কমরেড তপন ভৌমিকের নেতৃত্বে মিছিল নিয়ে শ্রমিকরা ডিএম অফিসে যান। মালিকের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিতে অপারগ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার, এই মিছিলকে মোকাবিলা করতে বিশাল পুলিশবাহিনী মোতায়েন করেছিল। এখানে তাদের তৎপরতার অভাব হয়নি, হয় না। কেবলমাত্র মালিকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতেই পা আটকে যায়।

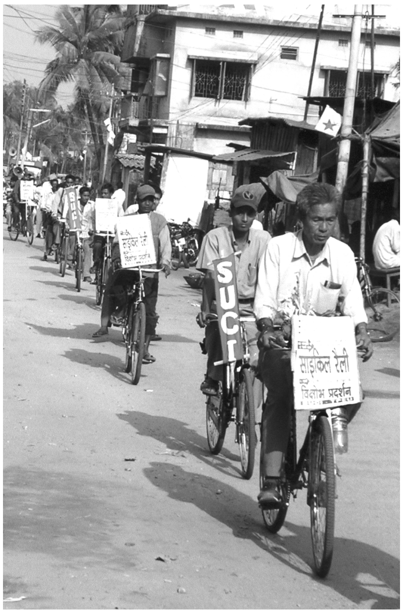

মিছিলের পুরোভাগে সত্তরোর্ধ্ব কমরেড কাঞ্ছা রানার

ইউনিয়নের সহ-সম্পাদক কমরেড অভিজিৎ রায় বলেন, অবিলম্বে সরকার ইতিবাচক পদক্ষেপ না নিলে আরো বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৩০৯৩৬৩৪৫, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ ই-মেল ঃ suci_cc@vsnl.net